সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র

তৃতীয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ›› অক্টোবর ২০১৭ ›› পাঁচ টাকা

শাসকের কাছে এই চোখের জলের মূল্য নেই

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, 'ভাত দেবার মুরোদ নাই কিল দেয়ার গোঁসাই।' বর্তমানে দেশের খেটে খাওয়া মানুষের জন্য এ কথাটা যেন এক মহাসত্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। প্রতিনিয়ত জীবন যাপনের খরচ বেড়ে যাচ্ছে, গ্যাস-বিদ্যুৎ-তেলের দাম হু হু করে বাড়ছে, গাড়ি ভাড়া-বাড়ি ভাড়া লাগামহীন। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

রোহিঙ্গা সংকট : জাতিগত নিপীড়ন ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

রোহিঙ্গা গণহত্যা ও তা থেকে উদ্ভূত সংকট নিয়ে আমাদের দেশে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা চলছে। এত বিরাট সংখ্যার শরণার্থীর চাপে আমাদের দেশকে এর আগে পড়তে হয়নি। জাতিসংঘের হিসেবে এ পর্যন্ত পাঁচ লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা এদেশে প্রবেশ করেছে। পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা তাদের অভিজ্ঞতার যে ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েছে, সেটা দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। ধারণা করা হয় মিয়ানমারে প্রায় এক হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়েছে। পালিয়ে আসতে গিয়ে ট্রলার ও নৌকা ডুবে মারা গেছে প্রায় দেড়শত মানুষ। নাফ নদী দিয়ে এখনও ভেসে আসছে লাশ। স্বাভাবিকভাবেই রোহিঙ্গা সংকটের কারণ, এই জনগোষ্ঠীর ইতিহাস- এসব নিয়ে ব্যাপক মাত্রায় আলোচনা চলছে। টিভি ও প্রিন্ট মিডিয়ায় এসেছে অনেক রিপোর্ট। অনেক কথাই এখন শিক্ষিত-সচেতন মানুষের আজ জানা, তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কও হচ্ছে ব্যাপক মাত্রায়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

রোহিঙ্গারা বসবাস করে মিয়ানমারের পশ্চিম দিকে রাখাইন রাজ্যে। এর পূর্ব নাম ছিল আরাকান। দুটো বড় জনগোষ্ঠী এই রাজ্যে বাস করে – রাখাইন ও রোহিঙ্গা। আরও কিছু ছোট জনগোষ্ঠীও আছে, তবে খুব অল্প সংখ্যায়। বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন রাখাইন রাজ্যের উত্তরাংশে প্রধানত রোহিঙ্গারা বসবাস করে।

রাখাইনে রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদে রাখাইন জনগোষ্ঠীর লোকেরাও জড়িত। তবে মিয়ানমারের মূল জনগোষ্ঠী কিন্তু রাখাইন নয়। মূল জনগোষ্ঠীর নাম বর্মী বা বার্মান – এরা মূল জনসংখ্যার আশি শতাংশ। এরা ছাড়াও শান, কাচিন, কারেন, কায়ান প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এখানে আছে। তাদের সবার সাথেই বর্মীদের একটা বিরোধ আছে। সেটার একটা কারণ আছে। সে বিষয়ে আমরা পরে আসব।

পুরো মিয়ানমার জুড়েই রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে এই মনোভাব আছে যে, তারা বাংলাদেশের লোক, মিয়ানমারের নাগরিক নয়। ১৯৮২ সালে মিয়ানমারের সামরিক সরকার যে নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন করেছিল তাতে রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। সেই সংবিধানে নাগরিকের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছিল এইভাবে যে, যারা ১৮২৩ সালের আগে থেকে মিয়ানমারে বসবাস করে তারাই সে দেশের নাগরিক বলে গণ্য হবে। এরপরে যারা এসেছে তারা সে দেশের নাগরিক নয়। ১৮২৩ সালকে সীমা ধরার কারণ হলো ১৮২৪ সালে বৃটিশরা চট্টগ্রাম থেকে গিয়ে মিয়ানমারের একটি অংশ দখল করে। *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

চাল নিয়ে চালিয়াতি

খাবারের কষ্ট কী এদেশের মানুষের কাছে তা অজানা নয়। এই দেশে স্বাধীনতার পরে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, খাদ্যের তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে আরও নানা সময়ে। তাই এখানে বেশিরভাগ জনগণের মধ্যে দারিদ্র আর অনাহার ক্লিষ্ট চেহারাই সাধারণভাবে দৃশ্যমান। অথচ ছোটবেলা থেকেই আমরা বইয়ে পড়ি – 'সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ।' কথাটা মিথ্যা নয়। এদেশের কিছু অঞ্চলে এক বছরে তিনবার ফসল হয়, ধান-ভুট্টা-গম-আখসহ কত জাতের খাদ্যশস্য হয়, মাটির নীচে গ্যাস-কয়লার মজুদ আছে আর মাটির উপরে আছে সোনালী ফসল। পানির কোনো দুষ্প্রাপ্যতা নেই। প্রাকৃতিকভাবে সমৃদ্ধ এমন দেশ পৃথিবীতে কয়টা আছে? পরিসংখ্যানও বলছে, স্বাধীনতার পর জনসংখ্যা আড়াই গুণ বাড়লেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় সাড়ে তিনগুণ। কিন্তু তবুও এখানে মানুষের তীব্র অভাব। চারিদিকে নিরন্ন-বুভুক্ষু মানুষের সারি। তারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও প্রায়ই না খেয়ে থাকে।

প্রসঙ্গটা এলো, দেশে চালের দামের ভয়াবহ ঊর্ধ্বগতির পরিস্থিতিতে। মোটা চালের দামই এখন ৫০ টাকা বা তার উপরে। এর চেয়ে একটু চিকন চালের দাম ৬০-৬২ টাকা। চালের এমন মূল্যবৃদ্ধি, এর তীব্র প্রভাব পড়ছে গরীব-নিম্নবিত্ত মানুষদের উপরে। উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন ৫ জনের একটি পরিবারে দিনে ৩ কেজি চাল লাগলে মাসে লাগছে ৯০ কেজি চাল। যদি চালের কেজি ৫০ টাকা ধরি, তাহলে তাহলে মাসে কেবল চাল বাবদ খরচ হবে ৯০ x ৫০= ৪,৫০০ টাকা। একজন শ্রমজীবী মানুষের গড় আয় ৫-৬ হাজার টাকার বেশি তো নয়। তার মানে কেবল চাল কিনতেই তাদের প্রায় পুরোটা খরচ হয়ে যাচ্ছে। এর বাইরে যা থাকে তা দিয়ে কোনো রকমে অন্যান্য খাদ্যপণ্য কিনতে পারছে, কেউ পারছে না। শিক্ষা-চিকিৎসায় খরচের কথা অনেকে চিন্তাও করতে পারে না। আমাদের মতো দেশে সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলোরও আয়ের *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ স্মরণে উদ্বোধনী সমাবেশ

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চেতনায় পুঁজিবাদবিরোধী লড়াই জোরদার করুন

৬ অক্টোবর শাহবাগে উদ্বোধনী সমাবেশে জমায়েতের একাংশ

সভ্যতার বয়স কয়েক হাজার বছরের। একদিনের গুহাবাসী মানুষ উদ্ভাবন করেছে সুউচ্চ অট্টালিকার। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-চিকিৎসাশাস্ত্রসহ বস্তুগত ও ভাবগত উৎপাদনে অভাবিত উন্নতি ঘটেছে। প্রকৃতির অন্যসকল প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। শুধু পৃথিবীতে নয় পদচারণা ঘটিয়েছে পৃথিবীর বাইরেও। কিন্তু এতসব উন্নতির পরও শ্রমজীবী মানুষরা থেকেছে সম্পদের মালিকানা থেকে বঞ্চিত। এই মালিকানার প্রশ্নটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে সেই সুদূর অতীত থেকে কেবল এই প্রশ্নে বহু বিদ্রোহ-বিপ্লব এবং তার ধারাবাহিকতায় সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনও সূচিত হয়েছে। কিন্তু আজও আসেনি তার সম্পূর্ণ সমাধান। মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এই প্রশ্নটিকেই সামনে এনেছিলেন। বৈজ্ঞানিকভাবে দেখিয়েছিলেন সমাজ পরিবর্তনের ধারা, সম্পত্তি সৃষ্টির ইতিহাস, মানুষে-মানুষে বৈষম্য সৃষ্টির কারণ, পরিবার-রাষ্ট্রের সূচনার কথা। তাঁরাই তুলে ধরেছিলেন লক্ষ-কোটি মানুষের হাতে সৃষ্টি হওয়া সম্পদ অল্প ক'জনের মুঠোবন্দী হওয়া নৈতিক কিংবা যৌক্তিক নয়। *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষের সমাপনী সমাবেশ

৭ নভেম্বর, বিকেল ২.৩০ টা

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ঢাকা

বক্তব্য রাখবেন :

ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীসহ বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ

অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটি

আবারও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির পাঁয়তারা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বাড়তে সর্বশেষ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে ৪৪ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকায়। এই পরিসংখ্যান থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়, আগামী পাঁচ দশ বছরে বিদ্যুতের দাম কোথায় গিয়ে ঠেকবে! এই যে বিশাল দেনা বা লোকসানের কথা বলা হচ্ছে – এর জন্য আসলে দায়ী কে? এর জন্য তো বিদ্যুৎ বিভাগের কোনো আমলা-কর্মকর্তার বেতন কেটে নেওয়া হবে না, কিংবা কারো বেতন-ভাতা এতটুকু কমবে না। এই দেনার ভার আসলে জনগণের উপরেই চাপানো হচ্ছে এবং আগামী দিনেও হবে। কিন্তু জনগণের এই টাকা আসলে যাচ্ছে কোথায়? কেন দেনা কিংবা লোকসান? তাহলে লাভটা হচ্ছে কার?

সরকারের বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি ও বিতরণকারি দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাইকারি দামে বিদ্যুৎ ক্রয় করে বিতরণকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ অঞ্চলভেদে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। বিতরণকারি কোম্পানি বা সংস্থাসমূহ পাইকারি ক্রয়মূল্যের সাথে সরবরাহ মূল্য যুক্ত করে গ্রাহকের কাছে বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। পিডিবি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং একই সাথে বেসরকারি বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে। আর ডেসা, ডেসকো, ডিপিডিসি, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ করে।

এবার আসি আসল কথায়, মোট বিদ্যুতের কতভাগ সরকার নিজের বিদ্যুৎ উৎপানকারি প্রতিষ্ঠান বিপিডিবি'কে দিয়ে উৎপাদন করান? বিপিডিবি'র উৎপাদন তথ্য মতে, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে দেশের মোট প্রায় পাঁচ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৭০ শতাংশ ছিল বিপিডিবি'র। এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার মেগাওয়াটে আর তাতে বিপিডিবি'র উৎপাদন ক্ষমতা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৩ শতাংশে। নিজস্ব উৎপাদন সক্ষমতাকে সংকুচিত করে সরকার দেশের বিদ্যুৎ চাহিদার সিংহভাগ ছেড়ে দিয়েছে বেসরকারি বাণিজ্যিক খাতে। অস্থায়ী স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতার এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্রই রেন্টাল-কুইক রেন্টাল নামে পরিচিত। ছোট ছোট এইসব বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালিত হয় ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল দিয়ে। গ্যাসের চেয়ে তেল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ আটগুণ বেশি। এসব কেন্দ্র থেকেই বিপিডিবি ইউনিট প্রতি ৮ টাকা ২৫ পয়সা হতে ১৯ টাকা ৯৯ পয়সা পর্যন্ত দরে বিদ্যুৎ ক্রয় করে। তাদের কাছ থেকে চড়া মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় করে ভর্তুকি বা ঋণ গ্রহণ করে জনগণের কাঁধের ওপর বাড়তি দামের বোঝা চাপিয়ে দিলেই তো হলো! ভর্তুকি ঋণ কিংবা সুদের টাকা সেটাও তো জনগণেরই টাকা। জনগণের টাকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে সরকার পঙ্গু-অথ র্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে শতরকম সুবিধা দিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিচ্ছে।

পিডিবি যখন হাজার হাজার কোটি টাকার লোকসানের দায় জনগণের ওপর চাপাচ্ছে ঠিক উল্টো দিকে বসে এসবের মালিকরা ধারাবাহিকভাবে হাজার কোটি টাকার মুনাফা করছে। কয়েকটি রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ ব্যবসায়ী কোম্পানির 'কুইক' মুনাফাচিত্র দেখলেই বুঝা যাবে! ২০০৪ হিসাব বছরে ডরিন পাওয়ার অ্যান্ড সিস্টেমস লিমিটেডের নিট মুনাফা ছিল ১৬ কোটি টাকার নিচে। পিডিবি'র কাছে আরো বেশি বিদ্যুৎ বিক্রি করে ২০১৭ হিসাব বছরের প্রথম নয় মাসেই তা প্রায় ৫৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০১৪ হিসাব বছরে সামিট পাওয়ার লিমিটেডের নিট মুনাফা ছিল ২২২ কোটি টাকা। ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরের প্রথম তিন প্রান্তিকেই তা ৩০২ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের মুনাফা ২০১৪ হিসাব বছরে ৮৪ কোটি টাকার কম থাকলেও চলতি হিসাব বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত তা ১৪১ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ২০১৪ হিসাব বছরের ১২ মাসে শাহজিবাজার পাওয়ার কোম্পানির নিট মুনাফা ছিল ৪৭ কোটি টাকা, সর্বশেষ হিসাব বছরের প্রথম নয় মাসেই তা ৭৮ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ২০১৪ হিসাব বছরে বারাকা পাওয়ারের মুনাফা ছিল প্রায় ২৫ কোটি টাকা, সর্বশেষ হিসাব বছরের প্রথম নয় মাসে কোম্পানিটির নিট মুনাফা দাঁড়িয়েছে ৪১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা! এভাবেই জনগণের পকেট কেটে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটে নেয়ার রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে সরকার। সম্প্রতি আরো ১০টি নতুন রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন দিয়েছে। এসব বিদ্যুৎ ব্যাবসায়ীরা এই সরকারেরই জ্ঞাতি-গোষ্ঠী।

অনির্বাচিত মহাজোট সরকারের কথিত উন্নয়নের ফানুস বহু আগেই চুপসে গেছে। আইনের শাসন থেকে শুরু করে জনগণের মৌলিক-মানবিক অধিকার চরম আকারে লঙ্ঘিত। সেই সাথে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি জনগণের সাধারণ জীবন নির্বাহকেও দুর্বিষহ করে তুলেছে। চাল-ডাল-পেঁয়াজ-রসুন থেকে শুরু করে সমস্ত নিত্য পণ্যের দাম আকাশছোঁয়া।

অথচ আমরা বহুদিন ধরেই সুনির্দিষ্টভাবে বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের রূপরেখা সরকারের কাছে তুলে ধরেছি। সরকার কর্ণপাত করছে না। আমরা বলেছি- বেসরকারি বাণিজ্যিক রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বন্ধ করে বিপিডিবি'র নিজস্ব উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে হবে, বৃহৎ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট নির্মাণ করতে হবে, পুরোনো বিদ্যুকেন্দ্র সংস্কার, ডিজেল-ফার্নেস অয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে গ্যাস-সৌরশক্তি-নবায়ণযোগ্য জ্বালানীভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। একমাত্র এর মাধ্যমেই দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো ও সুলভে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব। কিন্তু সরকার এই নীতিতে এগুচ্ছে না। তারা কতিপয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থেই বিদ্যুৎখাতকে ক্রমাগত বেসরকারিকরণ করছে, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর করছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কী – তা নিয়ে বারবার আমাদের ভাবতে হবে। আমরা যদি টুঁ শব্দটিও না করি, যদি সবকিছু নির্বিবাদে মেনে নিই তবে খুব সহজেই এমন অগণতান্ত্রিক-অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়ে যাবে। শুধু এবার নয়, সামনে আরও বড় মূল্যবৃদ্ধির বোঝা আসবে। তাই আমাদের সংগঠিত হওয়া এবং প্রতিরোধে নামা ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই।

চাল নিয়ে চালিয়াতি

(১ম পৃষ্ঠার পর) ৭০ শতাংশ ব্যয় হয় খাবারের খরচে। ফলে অন্যান্য সমস্ত কিছু থেকে তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় কাটছাঁট করতে হয়। গত এক বছরেই মোটা চালের দাম বেড়েছে ৫০ শতাংশ, গত মাসেই সেটা বেড়েছে ১৮ শতাংশ। কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় সেই তুলনায় বাড়েনি।

যদিও চালের এমন ঊর্ধগতি এবারই প্রথম নয়। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও মোটা চালের কেজি ৪০ টাকা ও চিকন চাল ৫৬ টাকায় উঠেছিল। সেই থেকে বাড়তে থাকা চালের দাম আজও স্থিতিশীল হয়নি। চালের দাম বিএনপি শাসন আমলেও বেড়েছিল। তখন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, 'বেশি করে আলু খান, ভাতের উপর চাপ কমান।' রসিকতা আর কী? রসিকতা অবশ্য এখনও চলে। চালের এমন মূল্যবৃদ্ধির পরও খাদ্যমন্ত্রী বলতে পারেন, 'বাজার সরকারের নিয়ন্ত্রণেই আছে।'

কতটুকু যে নিয়ন্ত্রণে আছে সেটা বোঝা যায় যখন রিপোর্ট বের হয়, মাত্র ১২ জন চাল ব্যবসায়ীর হাতে গোটা চালের বাজার। তারা নির্ধারণ করে চালের মূল্য। সরকার তাদের চেনে, দেশের মানুষ তাদের জানে। কিন্তু কেউ তাদের টিকিটিও ছুঁতে পারে না। ছুঁবে কেমন করে? এমন ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি বলেই তো সরকার ক্ষমতায় আছে।

এই ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে সরকারের আনুগত্য বোঝা যায়, যখন দেখি এই খাদ্য ব্যবসায়ীদের স্বার্থেই সরকার শুল্ক ২৮ থেকে ৩ শতাংশে নামিয়ে আনে। এদের গুদামেই যায় আমদানিকৃত চাল। পরে তাদের বস্তায় ভরে সেগুলো আসে বাজারে। এর মধ্যে ব্যবসায়ীরা সরকারকে একটা শর্তও জুড়ে দিয়েছিল – পাটের বস্তা নয় প্লাস্টিকের বস্তাতে চাল বাজারজাত করার অনুমতি দিতে হবে। সরকার তাদের নাখোশ করেনি। এখন প্লাস্টিকের বস্তাতেই চাল বাজারে আসছে। এই সুযোগে প্লাস্টিকের ব্যাগেরও ব্যবসা করে নিচ্ছে তারা। লাভের গুড় সবই তাদের, কেবল জনগণের জীবনে হাঁসফাঁস উঠে যাবার যোগাড়।

রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের ক্ষমতায় যাবার সিঁড়ি হিসেবে এই ব্যাপারগুলোকে কাজে লাগায়। যেমন ২০০৯ সালে যখন নির্বাচন হলো তখন নির্বাচনী প্রচারণায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ১০ টাকা কেজিতে চাল দেবে। ব্যাপারটা একটা বেদনাময় হাস্যরসের বিষয়; মানুষ চাল কিনছে ৬০ টাকা কেজিতে। কষ্টের বিষয়, জনগণের জীবন নিয়ে এমন প্রহসন করার পরও সরকার ক্ষমতায় টিকে আছে।

আমাদের দেশে বোরো ও ইরি ধান সাধারণত আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের শেষ নাগাদ কৃষকের গোলা থেকে চলে আসে চালকলের মালিক কিংবা আড়তদারদের গুদামে। মিল মালিক ও আড়তদারেরা অতিমুনাফার লোভে তাদের মজুদ করা চাল বাজারে বিক্রি না করে অবৈধভাবে মজুদ করে রাখে। এতে বাজারে চালের কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়। ফলে দাম বাড়ে। এবার উপরি হিসাবে এসেছে বন্যা। মাস দুয়েক আগে পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে এসেছে প্রায় পাঁচ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। এই পরিস্থিতিতে চকচক করে উঠেছে এই ব্যবসায়ীদের মুনাফার চোখ। এমন সুযোগ তারা ছাড়বে কেন?

সরকার পরিচালিত ওএমএসের চালের দামও এবার গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু কতটুকু যৌক্তিক এই মূল্যবৃদ্ধি? গত কয়েক বছর ধরে তো মন্ত্রী-এমপিরা বলেই যাচ্ছেন, 'বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।' দেশের খাদ্য-গুদামগুলো নাকি ধান-চালে ভরা। তাহলে সেগুলো কোথায় গেল? পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে বছরে মোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। আর খাদ্য চাহিদা আছে ৩ কোটি টনের। তাহলে তো আরও ৬০ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত থাকে। খাদ্যসংকট তো থাকার কথা না। আর অর্থনীতির নিয়মেও তো আমরা জানি, যোগান বাড়লে মূল্য কমে। কিন্তু তা হচ্ছে কি? যদি এবারের বন্যার কারণে খাদ্য ঘাটতি কিছু হয়েও থাকে তাহলে সেটার পরিমাণ আসলে কত – সেটাও কি সরকার বলতে পারছে? আগে উদ্বৃত্ত হিসেবে যে খাদ্যশস্য ছিল তা ব্যবহার করার পরও কি চাল আমদানির প্রয়োজন ছিল? এগুলোর কোনোটারই কোনো সদুত্তর সরকার দিতে পারেনি। তার মানে কোথাও সমস্যা আছে। পত্রিকার নানা রিপোর্ট বলছে চাল উদ্বৃত্ত থাকার পরও সরকার প্রতি বছরই চাল আমদানি করেছে। বেশিরভাগটা আসছে ভারত থেকে। এবার এসেছে মিয়ানমার থেকে। প্রতিবছর বাম্পার ফসল ফলার পরও চাল যখন আমদানি করা হয় তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, ইচ্ছা করেই একটা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে আমদানি করার বাস্তবতা তৈরি করা হয়। এতে চাল ব্যবসায়ীদের যে বিপুল মুনাফা হয় – তা বলাই বাহুল্য। অথচ যে কৃষকরা খাদ্যের এমন ফলন ফলান, তারা কোনোবারই ন্যায্য মূল্যটা পায় না। তাদের উৎপাদন খরচও ওঠে না। যেখানে সরকারি হিসেবেই এক মণ ধান উৎপাদনের খরচ ধরা হয় ৮০০ টাকা, সেখানে প্রতি মণ ধান বিক্রি করে একজন কৃষক পায় মাত্র ৫২০-৫৫০ টাকা। যখন উৎপাদন করে তখন বেশি দামে সার, বীজ, কীটনাশক কিনতে হয়। আর যখন তা বিক্রি করতে যায় তখন বড় বড় চালব্যবসায়ীরা নামমাত্র মূল্যে কিনে নেয়। সবক্ষেত্রেই ঠকে দেশের গরীব জনগণ।

কিন্তু সরকার এই মূল্যবৃদ্ধির দায় নিতে নারাজ। তারা দায় চাপাচ্ছে কতিপয় ব্যবসায়ীদের উপর। আবার ব্যবসায়ীরা বলছে ভিন্ন কথা। তারা বলছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণেই নাকি চালের দাম বাড়ছে। আর খুচরা ব্যবসায়ী আর ক্রেতাদের অভিযোগ, মিলারদের সিন্ডিকেট সৃষ্টিই চালের মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ। চলছে সাপ-লুডু খেলা। মাঝখানে পড়ে জনগণের চিড়েচ্যাপ্টা হবার দশা।

এই অবস্থায় আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট। জনগণের সাথে এই তামাশা বন্ধ করুন। অবিলম্বে চালের দাম কমিয়ে আনুন। চিহ্নিত মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার ও বিচার করুন। একইসাথে ওএমএস পদ্ধতিতে খোলা বাজারে চাল বিক্রির উদ্যোগ নিন। ১০ টাকা দরে রেশনে চাল বিক্রি করুন। গ্রাম-শহরে অঞ্চলে ভিজিএফ, ভিজিডি ও টিআর কর্মসূচি চালু করে শ্রমজীবী মানুষের খাদ্যের সংস্থান করুন। একইসাথে কৃষকের ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিন।

সরকার বেঁচে থাকার অধিকারগুলোকে ক্রমাগত খর্ব করছে। সকল গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ভূলুণ্ঠিত করে একদলীয় শাসন পরিচালনা করছে। সকল প্রতিষ্ঠানকে পরিণত করেছে দলীয় সম্পত্তিতে। এমন পরিস্থিতিতে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য নিয়েও শুরু করেছে চূড়ান্ত ব্যবসা। চিন্তা আর মতপ্রকাশের অধিকার কেড়ে নিয়ে এখন হাত দিয়েছে পেটে। এ এক সর্বনাশা ব্যাপার। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে উঠলে সরকারের পুলিশ-র‍্যাব-সেনাবাহিনী কেউই তা থামাতে পারবে না। তাই সময় থাকতে উদ্যোগ নিন। জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকদের সাতটি কল্প কাহিনী

স্টিভেন গাউন্স

২২ বছর পূর্বে ১৯৯১ সালের ২৬ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়; মার্কসবাদের নামে বুর্জোয়া চিন্তার আমদানি যখন থেকে শুরু হলো, সেই সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রচারকেরা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘরে বাইরে অপপ্রচারের বন্যা বইয়ে দিতে থাকে। প্রচার করতে থাকে কিছু কাল্পনিক কাহিনী।

কিন্তু এই ধারণাগুলোর কোনোটাই সঠিক নয়। এই কল্প কথাগুলোর প্রথমটি হলো – 'সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সেখানকার জনগণের কোনো সমর্থন ছিল না।' এর জবাবে বলা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির ৯ মাস আগে ১৯৯১ এর ১৭ মার্চ সোভিয়েত নাগরিকরা একটি গণভোটে অংশ নেয়। যেখানে জানতে চাওয়া হয়েছিল তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে কিনা? সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙে দেয়ার সম্পূর্ণ বিপরীতে তিন চতুর্থাংশেরও বেশি মানুষ সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐক্যের পক্ষেই ভোট দেয়।

দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণা হলো – 'রাশিয়ানরা স্ট্যালিনকে ঘৃণা করে।' এধারণাও যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তার প্রমাণ 'রাশিয়া' নামে একটি টিভি চ্যানেল তিন মাস ধরে পাঁচ কোটি রাশিয়ান নাগরিকের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে চায় তাদের মতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাশিয়ান কারা? সেখানে দেখা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যিনি সাফল্যের সঙ্গে পশ্চিমী রাষ্ট্র কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের প্রচেষ্টা প্রতিহত করে ছিলেন সেই আলেকজান্ডার নভোস্কিকে প্রথম স্থান দেয়া হয়। দ্বিতীয় জার নিকোলাসের প্রধানমন্ত্রী পাইথর স্টলিপিন, যিনি রাশিয়ায় ভূমি সংস্কার কার্যকরী করেছিলেন, তাঁকে সমীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়। মাত্র ৫৫০০ ভোটের ব্যবধানে তৃতীয় স্থান দেয়া হয় জোসেফ স্ট্যালিনকে। যাঁকে পশ্চিমী মতামত সৃষ্টিকারীরা নিয়মিতভাবে একজন নির্মম স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন, যার হাত নাকি লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে রঞ্জিত।

কর্পোরেট ধনকুবের যারা পশ্চিমী আর্দশগত প্রচার কেন্দ্রের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে তাদের হৃদয় জয়ের দিকে যিনি ছোটেননি, তাকে সেই পশ্চিমী দুনিয়ায় গালিগালাজ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাশিয়ানদের মত সম্পূর্ণ অন্যরকম। রাশিয়ানরা স্ট্যালিনের শাসনে ভালো থাকার পরিবর্তে খারাপ অবস্থায় ছিলেন পশ্চিমী প্রচারকদের এই ধারণার সঙ্গেও এই জনমতের রায় অসঙ্গতিপূর্ণ। ২০০৪ সালের মে-জুন মাসে প্রকাশিত 'ফরেন অ্যাফেয়ার' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফ্লাইট ফ্রম ফ্রিডম হোয়াট রাশিয়ান থিংক এন্ড ওয়ান্ট' প্রবন্ধে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্যুনিস্ট বিরোধী ঐতিহাসিক রিচার্ড পাইপ একটি সমীক্ষার উল্লেখ করেন। ঐ সমীক্ষায় রাশিয়া ও সমগ্র বিশ্বের সর্বকালের ১০ জন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও নারীর তালিকা দিতে বলা হয়েছিল। যথেষ্ট বিরক্তির সঙ্গেই ঐ সমীক্ষার ফলাফল তুলে ধরে পাইপ দেখান যে– স্ট্যালিনকে পিটার দি গ্রেট, লেনিন ও পুশকিনের পর চতুর্থ স্থানে রাখা হয়।

তৃতীয় কাল্পনিক ধারণা হলো – 'সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ছিল অকার্যকরী।' একথা সত্য হলে তর্কাতীতভাবে ধনতন্ত্র সমপরিমাণে ব্যর্থ। ১৯২৮ সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা থেকে ১৯৮৯ সালে তা ভেঙে যাওয়ার সময় পর্যন্ত একমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছাড়া সোভিয়েত সমাজতন্ত্র কখনোই মন্দায় হোঁচট খায়নি বা পূর্ণ কর্মসংস্থানেও ব্যর্থ হয়নি।

দীর্ঘ ৫৬ বছর সময়কাল ধরে (১৯২৮-১৯৪১ ও ১৯৪৬-১৯৮৯, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সমাজতান্ত্রিক এবং তারা কোনো যুদ্ধে লিপ্ত ছিল না।) কোনো ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি মন্দা ছাড়া এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান কি কখনও অব্যাহতভাবে বিকশিত হয়েছে? তদুপরি ১৯২৮ সালে স্ট্যালিন যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু করেন তখন যে সমস্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র অর্থনৈতিক বিকাশের একই স্তরে ছিল সেই সমস্ত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চেয়ে সোভিয়েত অর্থনীতির বিকাশ ছিল দ্রুততর। এমনকি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্বের অধিকাংশ সময়ই সোভিয়েত অর্থনীতির বিকাশ ছিল মার্কিন অর্থনৈতিক বিকাশের চেয়েও দ্রুততর।

নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সোভিয়েত অর্থনীতি কখনোই মূল অগ্রসর ধনতান্ত্রিক শিল্প-অর্থনীতিগুলির সমান হতে বা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। যদিও তারা দৌড় শুরু করেছিল অনেক পেছন থেকে, আবার তা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর মতো কোনো সাহায্যও পায়নি। ক্রীতদাসত্বের ইতিহাস, ঔপনিবেশিক লুটতরাজ এবং অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ও অব্যাহতভাবে পশ্চিমী দুনিয়ার বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ঘাত প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে বিশেষ করে ক্ষতি করছিল পশ্চিমী সামরিক চাপের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার জন্য বৈষয়িক ও মানব সম্পদকে বেসামরিক অর্থনীতি থেকে যুদ্ধ অর্থনীতিতে ঘুরিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা পরিকল্পিত অর্থনীতি নয় বরং ঠান্ডা যুদ্ধ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা- যা সোভিয়েত ইউনিয়নকে অধিকতর শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িয়ে ফেলেছিল, তাই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পক্ষে অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর শিল্প অর্থনীতিগুলোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তথাপি, সোভিয়েত অর্থনৈতিক বিকাশকে পঙ্গু করার অব্যাহত পশ্চিমী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত অর্থনীতি যুদ্ধের সময় ছাড়া প্রতি বছরই তার অস্তিত্বের সমগ্র পর্যায়েই ইতিবাচক বিকাশ ঘটিয়েছে এবং সকলের জন্য বৈষয়িকভাবে নিরাপদে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেছে। কোন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এমন সাফল্যের দাবি করতে পারে?

চতুর্থ কল্পকথা হলো – 'সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে পুঁজিবাদেই আস্থা রেখেছে।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সোভিয়েত ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বা সমাজতন্ত্রই ফিরিয়ে আনতে চাইছে। একটি সাম্প্রতিক জনসমীক্ষায় উঠে এসেছে আটান্ন শতাংশ মানুষ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও বন্টনের পক্ষে রায় দিয়েছে। সেখানে মাত্র আটাশ শতাংশ মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত বন্টনের পক্ষে তাদের মত ব্যক্ত করেছে। চৌদ্দ শতাংশ মানুষ এ বিষয়ে তাদের মতামত দিতে পারেননি। অধ্যাপক পাইপ কর্তৃক আর একটি জনসমীক্ষায় বাহাত্তর শতাংশ মানুষ ব্যক্তি পুঁজির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে।

পঞ্চম যে কল্পকথাটি প্রচার করা হয় তা হলো, 'বাইশ বছর পর পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ দেখছে সোভিতে ইউনিয়নে ভাঙন তাদের জন্য ক্ষতিকর হয়নি; বরঞ্চ ভালোই হয়েছে।' কিন্তু এই ধারণাটিও সম্পূর্ণভাবে ভুল। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী এগারোটি পূর্বতন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মানুষ (রাশিয়া, ইউক্রেন, বেলারুশ, উজবেকিস্তান, কাজাকস্তান, জর্জিয়া প্রভৃতি) যারা ভেবেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন তাদের জন্য ভালো হবে, আজ তারা অনেকেই মনে করেন ভাঙনের ফলে তাদের ক্ষতি হয়েছে বেশি। বিশেষ করে যে বয়স্ক মানুষরা পূর্বতন সোভিয়েত ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তারা এই ক্ষতির দিকটি আরো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারছেন। সমাজতন্ত্র বিরোধী পাইপের দ্বারা সংগঠিত আর একটি সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে রাশিয়ার চার ভাগের তিন ভাগ মানুষের কাছেই সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন দুঃখজনক, যা একেবারেই অপ্রত্যাশিত তাদের কাছে যারা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের দমননীতি ও আর্থিক দুরবস্থার কথা বলেন।

ষষ্ঠ যে কাল্পনিক কাহিনীটি পুঁজিবাদের প্রচারকরা দাবি করে থাকেন – 'পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকরা আগের তুলনায় ভালো আছেন।' এক্ষেত্রে সকলেই জানেন কিছু লোক নিশ্চয়ই ভালো আছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বেশিরভাগ মানুষই কী ভালো আছেন? যেহেতু বেশিরভাগ মানুষই মানছেন যে তারা পূর্বতন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রেই ভালো ছিলেন এবং নতুন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাদের ক্ষতিই করেছে বেশি। তাই বলা যায় যে, বেশিরভাগ মানুষই নতুন বর্তমান ব্যবস্থায় ভালো নেই। এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয় যদি আমরা এই মানুষগুলির জীবনকাল (Life expectancy) সম্পর্কে আলোকপাত করি। একটি বিশ্ব বিখ্যাত স্বাস্থ্য পত্রিকা 'দি ল্যান্সেট'-এ সমাজতত্ত্ববিদ ডেভিড স্টাকলার ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষক মার্টিন ম্যাক্কি দেখিয়েছেন যে পূর্বতন সোভিয়েত ব্যবস্থার পর থেকে সেখানকার মানুষের জীবনকাল কীভাবে কমতে শুরু করেছে। খুব কম সংখ্যক পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশই তাদের পূর্বের জীবনকাল ধরে রাখতে পেরেছে। রাশিয়াতে পুরুষদের জীবনকাল ১৯৮৫ সালে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ছিল ৬৭ বছর। ২০০৭ সালে সেটি নেমে এসেছে ৬০ বছরে। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ আয়ুষ্কাল সব থেকে কমেছে। সমাজতন্ত্রের ভাঙনের পর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বহু অকাল মৃত্যু ঘটেছে এবং মৃত্যুর হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শার্লে শিরিসটো ও হাওয়ার্ড ওয়াটকিনের ১৯৮৬ সালের একটি গবেষণায় উঠে এসেছে যে পুঁজিবাদের সময় থেকে সমাজতন্ত্রের সময়ই জীবনকাল, শিশু মৃত্যুর হার, ক্যালোরি গ্রহণ এবং বাহ্যিক সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি আরো ভালো ছিল। অধ্যাপক পাইপের দ্বারা সংগঠিত আরো একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, রাশিয়ানরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে একটি ধাপ্পা হিসাবেই দেখেন। বেশিরভাগ রাশিয়ানরাই মনে করেন পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধনী ও প্রভাবশালী লোকেদের পরিচালিত সরকারের একটি মুখোশ মাত্র। কে বলেছে যে, রাশিয়ানদের বোঝার ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা নেই?

সপ্তম কাহিনীটি হলো – 'যদি পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকেরা সমাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে চাইত তাহলে তারা তা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেই করতে পারত।' কিন্তু বাস্তবে তা এত সহজ নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সেইসব নীতিকেই সমর্থন করে যা তাদের অনুকূলে, এমন নীতি নয় যা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে। যদিও সব আমেরিকান নাগরিক এই বীমার আওতার মধ্যে আসতে চান, কিন্তু সবার অন্তর্ভুক্তি হয়নি। তাহলে তারাও চাইলে এর জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটি সম্ভব নয়। কারণ এটি কিছু শক্তিশালী ও বিত্তবান বেসরকারি বীমা কোম্পানির স্বার্থের প্রতিকূলে যাবে, তাই তারা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে এই নীতি স্থগিত করে রেখেছে। তাই বলা যায়, যা জনমোহিনী তা সব সময় সমাজে স্থান পায় না, সেখানে বিত্তবানরা তাদের স্বার্থে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেন।

মাইকেল পেরেন্টি লিখেছেন, পুঁজিবাদ শুধুমাত্র একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, এটি একটি সমাজব্যবস্থা। একবার এটি প্রচলিত হয়ে গেলে ভোটের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদে পরিণত করা যায় না। তারা দপ্তর অধিগ্রহণ করতে পারে কিন্তু আসল ক্ষমতা সমাজের সম্পদ, উৎপাদন সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা, পুলিশ বিভাগ প্রভৃতি পুঁজিবাদীদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন আবার বিপ্লবের মাধ্যমেই হতে পারে, ভোটের মাধ্যমে নয়। কিন্তু বিপ্লব শুধুমাত্র মানুষের পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করে না। বিপ্লব তখনই ঘটে যখন পুরনো ব্যবস্থায় মানুষের জীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং দেশের বেশিরভাগ মানুষ সেই ব্যবস্থা থেকে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একটি বিকল্প রাজনৈতিক সংগ্রাম ও শক্তির জন্ম দেয়। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য রাশিয়ার মেহনতি, সাধারণ মানুষের সংগ্রাম ও শক্তি এখনও সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছতে পারেনি।

২০০৩ সালে একটি সমীক্ষা হয়েছিল যাতে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, যদি আবার সমাজতন্ত্র ফিরে আসে তাহলে তাদের মনোভাব কী হবে? সেই সমীক্ষায় দেখা গেল যে, মাত্র ১০ শতাংশ মানুষই এর বিরোধিতা করছে। সেখানে ২৭ শতাংশ মানুষ এটি মেনে নিতে প্রস্তুত। ১৬ শতাংশ মানুষ অন্য কোথাও যাবার কথা বলেছেন। আর মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ সক্রিয়ভাবে এটিকে প্রতিরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন।

তাই বলা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনে অনেকেই দুঃখিত, বিশেষ করে যারা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেখেছেন। কিন্তু সেইসব পশ্চিমী সাংবাদিক বা রাজনীতিকরা যারা তাদের পুঁজিবাদের চোখ দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেখেন তাদের কাছে বিষয়টি ভিন্ন। এখন বুর্জোয়া মিডিয়ার প্রচার সত্ত্বেও দু'দশকের বহুদলীয় গণতন্ত্র, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও বাজার অর্থনীতির অভিজ্ঞতা থেকে বেশিরভাগ রাশিয়ানই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চান। তাই বলা যায় সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল এটি সত্য নয়।

রুশ বিপ্লবের চেতনায় শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে

(১ম পৃষ্ঠার পর) তাঁরা কেবল সংকটের বর্ণনা করেননি। কীভাবে পাল্টাতে হবে – তুলে ধরেছিলেন তারও ইতিহাসসম্মত ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। সমাজ বিকাশের ধারায় সামাজিক মালিকানার অনিবার্যতা তাঁরা তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন কেমন করে আসবে সত্যিকারের মানবিক সমাজ যেখানে অবলুপ্তি ঘটবে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ। বলেছেন সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদই হলো মানব সভ্যতার আগামী দিনের ইতিহাস নির্ধারিত পথ। একমাত্র তেমন সমাজব্যবস্থাতেই খুলে যাবে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অবারিত রাস্তা। ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক মালিকানা।

মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তাকে ভিত্তি করে এবং তাকে আরও সমৃদ্ধ করে পৃথিবীর বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর (তখনকার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৫ অক্টোবর) ইতিহাসের পথকে নতুন দিকে মোড় ঘুরিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের সকল আক্রমণ-ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে লেনিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমাজতন্ত্রের ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আরেক রাষ্ট্রনায়ক মহান স্ট্যালিন পুরো দেশের জনগণকে যুক্ত করে রাজনীতি-অর্থনীতি-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ক্রীড়াসহ সকল ক্ষেত্রে এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সমাজতন্ত্র নেই কিন্তু সমাজতন্ত্র যে গৌরবগাথার সৃষ্টি করেছে তা ভোলেনি পৃথিবীর নানাপ্রান্তের শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষ। এবছর মহান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবার্ষিকী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এই বার্ষিকী পালিত হচ্ছে। গঠিত হয়েছে দেশের বাম-প্রগতিশীল দল-সংগঠন ব্যক্তিবর্গ নিয়ে 'অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটি'। এই কমিটির পক্ষ থেকে পালিত হচ্ছে নানা কর্মসূচি। আলোচনা সভা-সেমিনার-আলোকচিত্র প্রদর্শনী-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নানা আয়োজন হচ্ছে এবং আরও হবে। আগামী ৭ নভেম্বরে পালিত হবে শতবর্ষের সমাপনী কর্মসূচি।

গত ৬ অক্টোবর বিকাল ৪টায় ঢাকার শাহবাগে জাদুঘরের সামনে জাতীয় কমিটি'র মাসব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দরর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ আলম, বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, জাতীয় গণফ্রন্টের সমন্বয়ক টিপু বিশ্বাস, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, বাসদ (মাহবুব)'র নেতা শওকত হোসেন, গরীব মুক্তি আন্দোলনের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান মিলন, গণমুক্তি ইউনিয়নের নাসিরউদ্দিন নাসু। সমাবেশ সঞ্চালনা করেন নতুন দিগন্ত পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মযহারুল ইসলাম বাবলা।

সভাপতির বক্তব্যে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'রুশ বিপ্লব মানব মুক্তির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা। এ বিপ্লব মানুষের মুক্তির দিশা নির্দেশ করেছে। ঔপনিবেশিক শোষণে নিপীড়িত জাতিসমূহকে শোষণের নিগড় ভাঙ্গতে অনুপ্রাণিত ও সমর্থন জুগিয়েছে। ৭০ বছর স্থায়ী হবার পর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে পতন হয়েছে, তা সমাজতন্ত্রের পতন নয়, ধাপে ধাপে সমাজতন্ত্রের চিন্তা থেকে সরে আসার ফল। ছিল বাইরে থেকে পুঁজিবাদীদের উৎপাত, অবরোধ ও আক্রমণ। সোভিয়েতের পতনের ফলে সারা পৃথিবীর মানুষকে আজ চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। মানুষের ক্ষোভ ও দুর্দশা জানিয়ে দিচ্ছে সভ্যতা কোন বর্বরতায় গিয়ে পৌঁছেছে। এ ব্যবস্থা চললে পৃথিবীর ধ্বংস ঠেকিয়ে রাখাই অসম্ভব হবে।

বলা হচ্ছে নৈতিকতার অধঃপতন ঘটেছে। কিন্তু আসল সত্য হলো এই যে, পুঁজিবাদ তার নিজস্ব নৈতিকতাকেই সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। এই নৈতিকতা মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেয় না; মুনাফা চেনে, ভোগলালসায় অস্থির থাকে, মানবিক বিবেচনাগুলোকে পদদলিত করে। সম্প্রতি মিয়ানমারে যখন গণহত্যা চলছে, প্রাণভয়ে রোহিঙ্গারা পালিয়ে আসছে বাংলাদেশে। সেই সময় চীন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে পীড়নকারী মিয়ানমারের পক্ষে। রাশিয়ার আচরণও একই রকম। যে ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে, সেও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে মিয়ানমারের পক্ষে। কারণ একই – পুঁজিবাদী স্বার্থ। সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা এভাবে বার বার সামনে আসছে। ফলে অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপন কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং একটি উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, যা সমাজতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়ানো মানুষদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করবে। বৈজ্ঞানিক নিয়মেই পুঁজিবাদের বিনাশ হবে। পুঁজিবাদের বিনাশ মানে ব্যক্তি মালিকানার সমাপ্তি। আগামীর ভবিষ্যৎ হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানার পৃথিবীর পরিবর্তে সামাজিক মালিকানার মানবিক বিশ্ব গড়ার।'

সমাবেশে বাসদ (মার্কসবাদী) এর কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী বলেন, 'রুশ বিপ্লব হঠাৎ করে হয়নি। ইউরোপে যখন শিল্পবিপ্লব হলো, তখন বুর্জোয়ারা স্লোগান নিয়ে এসেছিল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার। কিন্তু দেখা গেল এগুলো কেবল কথার কথা। পরিলক্ষিত হলো, প্রতিনিয়ত একদল মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিপুল সংখ্যক মানুষের অভাব-দারিদ্র্য। এ বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান অনেকেই করেছেন। কিন্তু কার্ল মার্কস দেখালেন, শ্রমজীবী মানুষ প্রতিদিন যে সম্পদ সৃষ্টি করছেন, মালিকরা তাকে কুক্ষিগত করছে, লুট করছে। সে কারণেই সমাজে এত বৈষম্য, সে কারণেই যত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই সংকট দূর করতে হলে যারা উৎপাদন করছে তাদের মালিকানা থাকতে হবে। এই নীতির ভিত্তিতে রাশিয়াতে লেনিন বলশেভিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছেন, বহু লড়াই-সংগ্রাম এবং শেষ পর্যন্ত বিপ্লব করেছেন। ১৯০৫ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতেও আরেকটি বিপ্লব হয়েছে। সেই বিপ্লবে যেমন বলশেভিক পার্টি ছিল, অন্যান্য বামপন্থী দল ছিল তেমনি বুর্জোয়ারাও ছিল। সেদিন জারের শাসনের পতন ঘটিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল ধনিক শ্রেণি। তখন লেনিন দেশের শ্রমিক, কৃষক, সৈনিকদের আহ্বান করলেন, এখন আমাদের কর্তব্য হবে ধনিক শ্রেণির শাসনের বদল ঘটিয়ে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণির শাসন প্রতিষ্ঠা করা। তার ফলাফলে ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটেছে। আমরা মনে করি এই বিপর্যয় সাময়িক। কেননা সবাই মিলে সবার জন্য যে সম্পদ সৃষ্টি করছে যতদিন না পর্যন্ত সেই সম্পদে সবার মালিকানা নিশ্চিত হচ্ছে – ততদিন পর্যন্ত পৃথিবী ব্যাপী আজ যে সংকট চলছে তার সমাধান সম্ভব হবে না। এই সংকটের সমাধান পুঁজিবাদ দিতে পারবে না। এর একমাত্র সমাধান সমাজতন্ত্র। সম্পদের সামাজিক মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য আজ পৃথিবীব্যাপী শ্রমজীবী-নিপীড়িত মানুষ লড়ছে। বাংলাদেশেও শ্রমজীবী-শোষিত মানুষও সেই লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এর মাধ্যমেই আমরা অক্টোবর বিপ্লবের চেতনাকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করব।'

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহম্মদ বলেন, 'অক্টোবর বিপ্লব সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এর মানে হলো, মার্কস যাকে বলেছেন মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজ। তার ধর্ম-লিঙ্গ-জাতি-পেশা-গায়ের রং যাই হোক, তার ভিতরের যে সৃজনশীলতা তার পূর্ণ বিকাশ হবে। এমন একটি সমাজ যেখানে ব্যক্তির বিকাশ ও সমষ্টির বিকাশ সমন্বিত হবে। সে কারণে সোভিয়েত রাশিয়ায় সকল সম্পদের উপরে, ভূমিব্যবস্থার উপরে, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, জাতিসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছিল। এই বিপ্লবের কারণে কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ নয়, সারা পৃথিবীতে শোষিত মানুষ লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। বৃটিশদের বিরুদ্ধে উপনিবেশিক দেশগুলোর লড়াই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের লড়াই, কোরিয়ার লড়াই এমনকি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধও সোভিয়েত বিপ্লবের চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

আজ পৃথিবীব্যাপী পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে লড়াই হচ্ছে, প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষার জন্য যে লড়াই হচ্ছে, সেই লড়াইগুলো হচ্ছে অক্টোবর বিপ্লবের চেতনার লড়াই। নারীরা যখন নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, পাহাড়ে আদিবাসীরা যখন *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে চারণের 'শতবর্ষে ঐকতান'

নভেম্বর বিপ্লব সভ্যতার শুরু থেকে এযাবত মানুষের ওপর মানুষের সকল প্রকার শোষণ-নিপীড়ন থেকে রুশ দেশের মানুষকে মুক্ত করেছিল। অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রাকে উন্নত করেছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কাজের নিশ্চয়তাসহ মত প্রকাশের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করেছিল সংবিধানের মাধ্যমে। শুধু বস্তুগত ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিস্বার্থমুক্ত উন্নত মূল্যবোধের আধারে মানুষের চরিত্রকে বিকশিত করার অভিপ্রায়ে সাংস্কৃতিক জগতেও সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপ্লব ঘটিয়েছিল। সাহিত্য, নাটক, সিনেমা, সঙ্গীত অর্থাৎ শিল্পের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রেখেছিল সোভিয়েত দেশের শিল্পীরা। আজ আমাদের দেশে যখন শিল্প-সাহিত্যের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করছে তখন সোভিয়েতের দিকে তাকাতে হবে কী করে সেদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা সৃষ্টির এই বিপুল সম্ভার তৈরি করেছিল।

সেই প্রেরণা নিয়ে এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে গতিশীল করার লক্ষ্য নিয়ে মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে 'নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষে ঐকতান' শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়েছে। গত ২২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাসদ (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ইনচার্জ ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা ও সঞ্চালনা করেন সংগঠক সুস্মিতা রায় সুপ্তি। অনুষ্ঠানের শুরুতে ও শেষে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। গান, নাটক, আবৃত্তি, নাচ ইত্যাদি পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, গাইবান্ধা ও খুলনা জেলা শাখা।

ঠাকুরগাঁয়ে অটো শ্রমিকদের ৫ দফা দাবিতে স্মারকলিপি পেশ

বাংলাদেশে পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যে অটো শ্রমিকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এখন প্রায় ১১ লক্ষেরও বেশি অটো (ইজিবাইক) রাস্তায় চলছে। চালক, মালিক, মেকানিক মিলে ২০ লক্ষ এবং তাদের পরিবার পরিজন মিলে প্রায় ১ কোটি মানুষ এই জীবিকার উপর নির্ভর করছে। কিন্তু সরকারের নানা অযৌক্তিক নিয়মের কারণে প্রতিনিয়ত এই শ্রমিকভাইদের নানা নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। সরকার একদিকে বিভিন্ন কোম্পানির মাধ্যমে ইজিবাইক আমদানি করছে, পার্টস আমদানি করছে, ব্যাংক লোন দিচ্ছে অন্যদিকে বিভিন্ন সময় এই গাড়িগুলোকেই অবৈধ বলে আটক করছে। এছাড়া রয়েছে সরকারদলীয় শ্রমিক সংগঠনগুলোর চাঁদাবাজি, পুলিশের হয়রানি ইত্যাদি। এমন নানা হয়রানির ঘটনা প্রত্যহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ঘটছে।

ঠাকুরগাঁয়ে অটো শ্রমিকদের সাথে এমন ঘটনা ঘটার প্রতিবাদে 'অটো শ্রমিক অধিকার আন্দোলন'র ডাকে ৫ দফা দাবিতে জেলার ৩২টি স্ট্যান্ড কমিটির অংশগ্রহণে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক বরাবর দশ হাজার গণস্বাক্ষরসহ স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সমাবেশে 'অটো শ্রমিক অধিকার আন্দোলন'র উপদেষ্টা মাহাবুব আলম রুবেলের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও পঞ্চগড় জেলার বাসদ (মার্কসবাদী)র সমন্বয়ক তরিকুল আলম, অটো শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের আহ্বায়ক ফরিদ আহামেদ, বেলাল হোসেন, লাবু, খালেক, শাহাজাহান ও বিভিন্ন স্ট্যান্ড কমিটির নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে অটো শ্রমিকদের উপর সকল প্রকার চাঁদাবাজি বন্ধ, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা, শ্রমিক ইউনিয়ন করবার অধিকার প্রদান করতে সরকারের যথাযথ উদ্যোগের আহ্বান জানান।

শহীদ রুমী স্মৃতি পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

'পাঠাগার হোক মানুষ গড়ার হাতিয়ার' এই স্লোগান সামনে রেখে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় উদযাপিত হল ঢাকার কড়াইলে অবস্থিত 'শহীদ রুমী স্মৃতি পাঠাগার'-র ৩য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। গত পহেলা অক্টোবর'১৭ বনানীতে অবস্থিত টি এন্ড টি বালক উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল ১১ টায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হালিমা বেগম অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, 'পাঠাগার মানুষের মননশীলতা নির্মাণ করতে সহযোগিতা করে। ঢাকার মধ্যে আমাদের এলাকায় বেশিরভাগ মানুষ একদিকে নিম্ন আয়ের অন্যদিকে অবহেলিত। আমাদের বিদ্যালয়ে বছরের শুরুতে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখি তারা নানা অপরাধে যুক্ত হচ্ছে। এমন একটা জায়গায় পাঠাগার করে শিশুদের সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার জন্য সবাইকে অভিনন্দন জানাই।"

এছাড়া আলোচনা করেন বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডাঃ জয়দীপ ভট্টাচার্য। ঢাকা নগর শাখার শিশু কিশোর মেলা ও পাঠাগার সংগঠক ছায়েদুল হক নিশানের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শহীদ রুমী স্মৃতি পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক রাফসানুল এহসান সাজ্জাদ। আলোচনা সভা শেষে পাঠাগারের সদস্যদের অংশগ্রহণে গান, নাচ, আবৃত্তিসহ এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এর পর মাসব্যাপী পরিচালিত বিভিন্ন খেলায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে সারা দিনের কর্মসূচির সমাপ্তি হয়।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে বর্ধিত হোল্ডিং ট্যাক্স বিরোধী আন্দোলন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নতুন আরোপিত হোল্ডিং ট্যাক্স নিয়ে নগর জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সাবেক মেয়রদের আমলে স্থাপনার আয়তনের ভিত্তিতে গৃহকর আদায় করা হতো। নতুন আইন অনুযায়ী স্থাপনা পরিবর্তে ভাড়ার ভিত্তিতে ১৭% গৃহকর আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে গত বছর যে কর দিতে হত এই বছর সেই কর বেড়ে ১০/ ১৫ গুণ হয়েছে। একদিকে চালের মূল্য, বিদ্যুতের মূল্য, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি অন্যদিকে অসহনীয় এই হোল্ডিং ট্যাক্স মরার উপর খাড়ার ঘা। বাড়িয়ালা ভাড়াটিয়া সবাইকে এই করের বোঝা বইতে হবে। কারণ এরই সাথে ঘরভাড়া বাড়বে কয়েকগুণ হারে।

৩৬ নং ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা বলেছেন, 'গতবছর যে বাড়ির উপর ১৫ হাজার ট্যাক্স নির্ধারণ হয়েছে এই বছর সেটা বেড়ে ৩ লক্ষ টাকায় দাড়িয়েছে। ছোট্ট কাচা ঘরের ভাড়া পায় ১ হাজার ,বছরে আয় ১২ হাজার। সেই ঘরের উপর কর নির্ধারণ করা হয়েছে ১৩ হাজার! এমনি হাস্যকর সব এসেসম্যান্ট। যে বাড়ির ট্যাক্স দেয়া হয়েছে ১ লক্ষ টাকা গত বছর, এই বছর ট্যাক্স এসেছে ১০ লক্ষ টাকা।' সামান্য বৃষ্টিতে, জোয়ারের পানিতে চট্টগ্রাম বেশিরভাগ অঞ্চল ডুবে থাকে। বহদ্দার হাট থেকে লালখান বাজার পর্যন্ত বিরাট অংশের রাস্তা ভাঙ্গাচোরা বেহাল অবস্থা। সরকারের কথিত উন্নয়নের জোয়ার জনগণ দেখছে না, দেখছে দুইবেলা মহেশখালীর জোয়ার। জোয়ারের পানির জন্য স্কুল কলেজের পড়াশুনা, ব্যবসা বাণিজ্য স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাঘাত ঘটছে।

এই অবস্থায় হোল্ডিং ট্যাক্স বাতিলের দাবিতে 'চট্টগ্রাম করদাতা সুরক্ষা পরিষদ' এর উদ্যোগে আন্দোলন শুরু হয়েছে। গত এগারো মাস ধরে এই আন্দোলন চলছে। যদিও চসিক মেয়র এখনও তার সিদ্ধান্তে অনড়। গত ৮ই অক্টোবর ১০ টি ওয়ার্ডে একযোগে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। আগ্রাবাদ বাদামতলীর মোড় থেকে দেওয়ানহাট পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ স্মরণে সমাবেশ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) তাদের উপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, শিক্ষার্থীরা যখন শিক্ষার অধিকার নিয়ে লড়াই করছে, কৃষকরা যখন তার অধিকারের জন্য লড়াই করছে, দেশের জনগণ যখন সুন্দরবন রক্ষার লড়াই করছে – প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অক্টোবর বিপ্লবের চেতনা আছে। লেনিন বলেছেন, 'যেখানেই মানুষ সেখানেই আমাদের কাজ করতে হবে।' সব ধরনের শ্রেণিগত-লৈঙ্গিক-ধর্মীয়-জাতিগত নিপীড়ন-বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের লড়াই। প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষার লড়াইও আমাদের লড়াই। এ শুধু বাংলাদেশের লড়াই নয়, সারা বিশ্বের লড়াই। বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের লড়াইয়ের সাথে সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের লড়াইয়ের সম্পর্ক আছে। যে যেখানে আছে সেখান থেকেই এই লড়াই চালাতে হবে, আবার সমন্বয় করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের একটা ভূমিকা আছে। এটি পালন করতে পারলেই আমরা বলতে পারব মানুষ হিসেবে বৃহৎ স্বপ্ন দেখার সাহস আমরা রাখি। যে স্বপ্ন দেখার সাহস অক্টোবর বিপ্লব আমাদের দেখিয়েছিল।'

সমাবেশে ঢাকা এবং আশপাশের এলাকা থেকে বামপন্থী দলগুলোর কয়েক হাজার নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করে। বক্তব্য পর্ব শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন সাংস্কৃতিক পর্ষদের শিল্পীবৃন্দ।

ধর্মীয় উগ্রতা লুপ্ত করছে মনুষ্যত্ব-মানবিকতা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) হয়েছেন তাদের সকলের সকল বক্তব্যের সাথে আমরা একমত নই, তাদের মত প্রকাশের ধরন নিয়েও কথা থাকতে পারে, কিন্তু মতের ভিন্নতা থাকলেই তাকে মেরে ফেলতে হবে?

অথচ হত্যা করা হচ্ছে। একদিকে ধর্মীয় উগ্রবাদীরা এই কাজ করছেন, আরেকদিকে রাষ্ট্রও একই কাজ করছে। মতের ভিন্নতা হলে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, গুম করে দেয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় বাহিনী এসবে কীভাবে জড়িত তা প্রকাশ্যে এসেছে। তারপরও এর কোনো পরিবর্তন ঘটছে না।

ভারত এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে মাত্রাগত ভিন্নতা থাকলেও স্বাধীন মতপ্রকাশের ওপর এবং বিরোধী চিন্তার ওপর আক্রমণের ধরন একই। আসলে শুধু এ দুই দেশে নয়, গণতান্ত্রিক বলে পরিচিত ইউরোপ-আমেরিকাসহ গোটা দুনিয়া জুড়েই ভিন্ন মতের ওপর হামলা ও আক্রমণের ধরন এক। ব্যক্তি পর্যায় থেকে রাষ্ট্র-সমাজ সর্বত্রই একটা মনোভাব প্রবল হচ্ছে – কোনো সমালোচনা করা যাবে না, বিরোধিতা করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই মনোভাব ও শাসন পদ্ধতিকে আমরা ফ্যাসিস্ট হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকি। সমস্ত গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার মানুষ আজ এই উগ্রতা ও ফ্যাসিস্ট প্রবণতার উত্থানে শঙ্কিত। মানুষ ভাবছে, এই উগ্রতার অবসান কীভাবে হবে? বাংলাদেশে রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে মৌলবাদী শক্তিকে মোকাবেলা করার একটা প্রচেষ্টা আমরা দেখছি। এ প্রচেষ্টা সমাজ মনন থেকে মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট মনন কি দূর করতে পারছে? না। বরং এই মনন ক্রমাগত বাড়ছে।

তাহলে উপায় কী? উপায় হলো, এসব হত্যাকাণ্ড বা আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো, বিচার আদায় করার জন্য রাষ্ট্রের ওপর চাপ প্রয়োগ করার পাশাপাশি সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার অন্দোলন জোরদার করা। গণতান্ত্রিক চিন্তা যতটুকু আছে তা প্রসারের জন্য চেষ্টা করা। অজ্ঞতা, কূপমণ্ডূকতা, উগ্রতার হাতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি-মানবিক মূল্যবোধকে ছেড়ে দেয়া যায় না।

নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা সংগ্রহ করুন

মূল্য : ২০ টাকা

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সাহায্যের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণও জরুরি

(১ম পৃষ্ঠার পর) এই প্রবেশটা দু'দিক দিয়ে ঘটেছে। একদিকে চট্টগ্রাম দিয়ে সে এলাকার লোকেরা রাখাইনে গেছে। কারণ রাখাইন একটি সম্পদশালী রাজ্য। চাষের জমিও সেখানে সে সময় অনেক ছিল। স্থানীয় রাখাইনদের তুলনায় চট্টগ্রামের লোকেদের কৃষিকাজে দক্ষতাও ছিল বেশি। আবার কলকাতা থেকে সরাসরিও রেঙ্গুনে এসেছে অনেক লোক। তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও ছিল। তারা সেখানে অফিস-আদালতে কাজ করত, ব্যবসা-বাণিজ্যও করত। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে কলকাতা থেকে রেঙ্গুনে জাহাজ ভ্রমণের এক উপভোগ্য বর্ণনা আছে।

এখন একথা ঠিক যে, রোহিঙ্গারা চট্টগ্রামেরই লোক। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে চট্টগ্রামের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির সামঞ্জস্যও আছে। তবে এই যাওয়াটা ১৮২৩ সালের পরই ঘটেছে – একথাটা ঠিক নয়। এর আগেও অনেকেই এদিক থেকে গেছে। বসতি গড়েছে। ১৪৩০ সালের দিকে আরাকানের রাজা ছিলেন নারা মিখলা মিন স মন। তিনি পাশের রাজ্যের এক রাজা দ্বারা উৎখাত হয়ে পালিয়ে চট্টগ্রামে আসেন। তখন বাংলার সুলতান ছিলেন জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ। তিনি মিখলাকে আশ্রয় দেন। পরে জালালুদ্দিনের সহায়তায় মিখলা তার রাজ্য ফিরে পান। শর্ত ছিল – আরাকান বাংলার করদ রাজ্য হিসেবে থাকবে। সেই সময় জালালুদ্দিনের অনেক সৈন্য, কর্মচারী ও বিভিন্ন পেশার লোক আরাকানে স্থায়ী হন। সরকারি বিভিন্ন কাজেও মিখলা কিছু লোককে যুক্ত করেন।

ফলে বোঝা যায়, যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। ১৭৯৯ সালে ইংরেজ গবেষক ফ্রান্সিস বুকাননের প্রতিবেদনেও আরাকানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির উপস্থিতির উল্লেখ আছে। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই সেটা ১৮২৩ সালের পর থেকে শুরু হয়েছে তাহলেও তো প্রায় দু'শ বছর হতে চলল। এতদিন ধরে কোন গোষ্ঠী একটা স্থানে বসবাস করলে তাকে হঠাৎ করে অভিবাসী আখ্যা দেয়া যায়না। নাগরিকত্ব আইনে এরকম ধারা আনা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক। আধুনিক রাষ্ট্র ও তার সংবিধানে এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

রাখাইন ও বর্মীদের সাথে রোহিঙ্গাদের দ্বন্দ্বের আরও কিছু বাস্তবসম্মত ফ্যাক্টর আছে। প্রথমত, ১৮২৪ সালে ব্রিটিশরা মিয়ানমার দখল করার পর তারা ওই এলাকার বিভিন্ন কাজে রাখাইনদের থেকে রোহিঙ্গাদের গুরুত্ব বেশি দিত। সেটা স্থানীয় রাখাইনদের মনে প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। রাখাইনরা রোহিঙ্গাদের ব্রিটিশদের অনুগত মনে করতো। আবার ব্রিটিশদের হাত থেকে জাপান ১৯৪২ সালে মিয়ানমার দখল করে নেয়। তখন জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ব্রিটিশরা রোহিঙ্গাদের মধ্যে সশস্ত্র গ্রুপ তৈরি করে। এরা জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। অথচ এদিকে দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জাপানিদের সাহায্য নিয়ে লড়াই করেছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অং সান সুকির বাবা অং সান। তিনি ছিলেন মিয়ানমারের জাতীয়তাবাদী নেতা। ফলে একদিকে অংসান আর অন্যদিকে রোহিঙ্গারা দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু কিছুদিন পর অং সান বুঝলেন যে, জাপানিরা মিয়ানমারের স্বাধীনতা দেবে না। তখন তিনি ব্রিটিশদের সাথে সমঝোতা চুক্তিতে আসেন। এদিকে রোহিঙ্গারা তো ব্রিটিশদের পক্ষেই ছিল। ১৯৪৫ সালে মিয়ানমার আবার ব্রিটিশদের হাতে আসে। ১৯৪৮ সালে স্বাধীন হয়।

দ্বিতীয়ত, ১৯৪৮ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ১৯৪৭ সালে যখন ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের কথাবার্তা চলছিল, তখন রোহিঙ্গা নেতারা 'আরাকান মুসলিম লীগ' গঠন করে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। তারা তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সাথে দেখাও করেন। কিন্তু জিন্নাহ্ এ বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেননি। আর এও ঠিক দেশভাগের পরিকল্পনা হচ্ছিল অবিভক্ত ভারতবর্ষকে নিয়ে। সেখানে মিয়ানমার ছিল না। তাই হয়তো তাদের এ দাবি ততটা গুরুত্ব পায়নি মুসলিম লীগ নেতাদের কাছে।

তৃতীয়ত, মিয়ানমার স্বাধীন হওয়ার পর রোহিঙ্গাদের দেশের নাগরিক হিসেবে থাকতে কোনো বাধা ছিল না। পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধিও ছিল। সব রকম অধিকারই তাদের ছিল। ১৯৫০ সালের দিকে কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গা 'রোহিঙ্গা মুজাহিদিন ফোর্স' গঠন করে আরাকানকে স্বাধীন করতে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। যদিও তাদের এই আন্দোলন শক্তিশালী ছিল না। 'রোহিঙ্গা মুজাহিদিন ফোর্স' কিছুদিন ক্রিয়া করে একসময় স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৬১-৬২ সালের দিকে তারা সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আন্দোলন শুধু রোহিঙ্গারাই করেনি, এইরকম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মিয়ানমারের বিভিন্ন রাজ্যে এখনও আছে।

চতুর্থত, ১৯৬২ সালে সামরিক সরকার মিয়ানমারের ক্ষমতায় আসে। তারা এসেই রোহিঙ্গাদের দেশের জন্য হুমকি মনে করা শুরু করল। কারণ হিসেবে দেখালো যে, রোহিঙ্গাদের বসবাস সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায়, তারা আগেই পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হতে চেয়েছিল, স্বাধীনতার পরেও তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রম অব্যাহত রাখে ইত্যাদি। এর সাথে তাদের সম্পর্কিত পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি তো ছিলই। রাখাইনদেরও রোহিঙ্গাদের প্রতি পূর্বের ক্ষোভ ছিল। এসবই তখন একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। রাখাইনে রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি ক্রমশ নাজুক হতে থাকে।

এইসকল বিষয়সমূহ ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছিল। রোহিঙ্গাদের প্রতি রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ক্রমেই বাড়তে থাকল। প্রথম সামরিক অভিযান পরিচালিত হলো ১৯৭৮ সালে। তখন প্রায় আড়াই লক্ষ রোহিঙ্গা এদেশে এসে আশ্রয় নেয়। ১৯৭৯ সালে এদের ফিরিয়ে নেয়া হয়। দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয় ১৯৯১ সালে। তখনও আরেক দফায় মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়। এভাবে থেমে থেমে এই সংকট চলছেই।

ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য

মিয়ানমারের ঘটনায় পাশের দেশ হলেও চীন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। চীন একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ। কমিউনিজম ত্যাগ করার পর নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তার আগের সেই দায়বদ্ধতা নেই। চীনের এই এলাকাকে নিয়ে কিছু পরিকল্পনা আছে। রাখাইন বেশ সম্পদশালী রাজ্য। রাখাইন রাজ্যের অভ্যন্তরে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে

বাসদ (মার্কসবাদী)'র ত্রাণ বিতরণ

প্রচুর গ্যাস পাওয়া গেছে। এগুলো উত্তোলনের কাজ করছে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া। চীন রাখাইন থেকে চীনের কুনমিং পর্যন্ত গ্যাস ও তেলের পাইপলাইন স্থাপন করেছে। চীনের তেল ও গ্যাস পরিবহনের একমাত্র পথ হলো মালাক্কা প্রণালী দিয়ে। এই পথের চারপাশে সে সকল দেশ অবস্থিত তাদের সাথে চীনের সম্পর্ক ভাল নয়। এরা আমেরিকার অনুগত। কোনো কারণে সমস্যা শুরু হলে এই পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই চীনের একটা বিকল্প পথ দরকার। সেজন্য এই পথ তারা তৈরি করেছে।

ভারতেরও অর্থনৈতিক স্বার্থ এখানে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভারত গ্যাস উত্তোলন করছে। এখানে তেল পাবারও সম্ভাবনা আছে। আবার ভারত একটা ট্রানজিট চালু করছে মিয়ানমারের ভেতর দিয়ে। সেটাও রাখাইনের উপর দিয়ে যাচ্ছে। এর নাম 'কালাধন প্রজেক্ট'। ভারত এতে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এতে ভারতের হলদিয়া পোর্ট থেকে রাখাইনের সিতওয়া পোর্টে কালাধন নদী এসেছে। এটা মিয়ানমারের ভেতর দিয়ে ভারতের মিজোরামের কাছে একটা পোর্টে মিলিত হচ্ছে। 'সেভেন সিস্টার্স' নিয়ে ভারত বরাবরই উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভৈরব-আখাউড়া-ত্রিপুরা হয়ে একটা ট্রানজিট তারা ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে। এটা কখনও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেলে বিকল্প হিসেবে তারা যাতে অন্যটা ব্যবহার করতে পারে তার জন্য হলদিয়া থেকে মিজোরাম পর্যন্ত রাখাইনের ভেতর দিয়ে এই পথের ব্যবস্থা করে রাখছে।

এখানে আমেরিকার অবস্থান খুবই মানবিক মনে হতে পারে। কারণ তারা এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে খুব সরব। বাস্তবে আমেরিকার ইতিহাস তা বলেনা। তাদের স্বার্থে লক্ষ লক্ষ লোককে তারা হত্যা করতে কখনও দ্বিধা করেনি, এখনও বিশ্বব্যাপী তারা হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাদের এই প্রতিক্রিয়া মূলত এ অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার হিসেব-নিকেশকে কেন্দ্র করে। যাতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হওয়ার দোহাই দিয়ে এখানে তাদের হস্তক্ষেপের একটা সুযোগ তৈরি হয়।

আরও কিছু বিষয়

মিয়ানমারে বর্মীদের সাথে অন্য জাতিগোষ্ঠীর সংঘাত নতুন কিছু নয়। আমরা আগেই বলেছিলাম, রেঙ্গুনে প্রচুর ভারতীয়রা ঢুকেছে এককালে। সেখানকার বেশিরভাগ ব্যবসাই ছিল এদের দখলে। এতে রেঙ্গুনের মূল অধিবাসীরা গুরুত্ব হারায়। আবার ইংরেজরা বিভক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইচ্ছে করেই চাকুরি-ব্যবসা ইত্যাদিতে ভারতীয়দের ও তার সাথে অবর্মী জাতিগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়েছে। ফলে গোটা মিয়ানমারেই বর্মীদের সাথে অবর্মী অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব আছে। বেশ কিছু দাঙ্গা ও সংঘর্ষ এ সময়কালে ঘটছে। রাখাইনে তো রোহিঙ্গাদের সাথে রাখাইনদের দ্বন্দ্ব আছেই, আবার একইসাথে জাতীয় ক্ষেত্রে বর্মীদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব আছে অবর্মী বলে। আর অভিবাসী হিসেবে বের করে দেয়ার কথা এলে প্রথমে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারটা আসাই স্বাভাবিক, কারণ তাদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতিই নেই।

আরেকটা ব্যাপার, মিয়ানমারের দেশ পরিচালনায় সেনাবাহিনীর বেশ বড় একটা প্রভাব আছে। পার্লামেন্টের এক তৃতীয়াংশ সিট সংরক্ষিত থাকে সেনাবাহিনীর জন্য। দেশ পরিচালনায় তাদের মতের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে খুবই আক্রমণাত্মক। সেনাবাহিনী প্রধান সম্প্রতি রাখাইনের ঘটনার ব্যাপারে যে ভাষায় কথা বলেছেন, তাতে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি রোহিঙ্গাদের একেবারে নির্মূল করে দেয়ার পক্ষে। শোনা যাচ্ছে, রাখাইনে একটা অর্থনৈতিক অঞ্চল হতে যাচ্ছে। বেসামরিক লোকদের সামনে রাখলেও পেছনে সামরিক বাহিনীর লোকেরাই মূলত জড়িত। একটা অর্থনৈতিক অঞ্চল করতে হলে বিরাট সংখ্যক লোককে উচ্ছেদ করার প্রয়োজন পড়ে। সবদিক বিবেচনা করে তারা দেখেছেন যে, সেক্ষেত্রে রোহিঙ্গা নিধনই উত্তম!

কী কী বিষয় ভেবে দেখা জরুরি

রোহিঙ্গাদের এই মানবিক বিপর্যয়ে দেশের মানুষ দারুণভাবে সাড়া দিয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পেশাজীবী সংগঠন সবাই এগিয়ে এসেছেন, ত্রাণ সংগ্রহ করেছেন, বিতরণ করেছেন। চিকিৎসকরা ছুটে গেছেন মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করতে। এ ব্যাপারটি খুবই আবেদন সৃষ্টিকারি। মানবিক বিপর্যয়ে যে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ায় এ ঘটনা আবারও তা প্রমাণ করলো।

আমাদের দল বাসদ (মার্কসবাদী)'র পক্ষ থেকে আমরা রোহিঙ্গাদের ত্রাণ কর্মসূচির জন্য মানুষের কাছে অর্থ সংগ্রহ করেছি। প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের রক্ষার তৎপরতা দেখিয়ে নোবেল পেতে চাইলেও তার পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ত্রাণ সংগ্রহে বাধা দিয়েছে। প্রথম দফা ত্রাণ বিতরণ আমরা শেষ করেছি। দ্বিতীয় দফায় ত্রাণ বিতরণ ও চিকিৎসা সেবা দেয়া হবে। ওই এলাকায় আমাদের অগ্রবর্তী দল ইতিমধ্যে গেছে। বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে আমাদের কিছু মূল্যায়ন আমরা পয়েন্ট আকারে তুলে ধরছি।

১. স্থানীয় মানুষেরা বেশ চিন্তিত, আর কয়েক বছর পর কি এখানে থাকা যাবে? কারণ টেকনাফ-উখিয়ার জনসংখ্যা হলো সাড়ে পাঁচ লাখ। আর নতুন পুরোনো রোহিঙ্গার সংখ্যা হলো ১০ লাখ, যা স্থানীয়দের থেকে দ্বিগুণ। এ বিশাল জনগোষ্ঠী যদি ফেরত না যায়, স্থানীয়রা কি টিকতে পারবে? ২. সংশ্লিষ্ট এলাকায় জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। ৩. রোহিঙ্গারা পেটের দায়ে খুবই সস্তায় শ্রম বিক্রি করছে। ফলে স্থানীয় লোকেরা কাজ পাচ্ছে না। ৪. ইউনিয়ন পরিষদ থেকে স্থানীয় গরীবরা যে সাহায্য পেত, তা এখন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ৫. রামুতে দেশের সব চেয়ে বড় ফানুস উৎসব হয় প্রতি বছর। এ বছর হয়নি। এক ধরনের আতংক কাজ করছে বৌদ্ধ মন্দির ও পল্লীগুলোতে। ২০১২ সালের রামু বৌদ্ধ মন্দির হামলার স্মৃতি এখনো তাদের ভাবায়। ৬. বেশিরভাগ স্বজনহারা অসহায় রোহিঙ্গা আজ নিদারুণ অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন। পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হলে তা প্রচণ্ড আক্রোশে পরিণত হতে পারে। ৭. দেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শক্তি এর মধ্যেই সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেয়া শুরু করেছে। এটি এই মুহূর্তে বন্ধ না করলে তা পরবর্তীতে ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। এরই মধ্যে পার্বত্য এলাকায় এই রকম উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেক আদিবাসী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ আতঙ্কে চট্টগ্রাম ছেড়ে নিজ নিজ এলাকায় চলে গেছেন। ৮. এইরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও ইয়াবা পাচার থেমে নেই। বরং বর্তমানের এই অবস্থা ইয়াবা পাচারের জন্য আরো অনুকূল।

মানবিক বিবেচনার বর্তমান পর্যায়ে মানুষ সাহায্যের হাতই প্রধানত বাড়িয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো কেউ মানবিক কারণে, কেউ তাদের নিজেদের এজেন্ডা নিয়ে হলেও মানুষকে ত্রাণ দিচ্ছে। কিন্তু স্থায়ী সমাধানের ব্যাপারে এদের বক্তব্য পরিষ্কার নয়। অন্যদিকে এ ব্যাপারে সরকারের নীতি ও কৌশল এখনো সুস্পষ্ট নয়। বরং এ ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টাতেই তারা তৎপর। এ অবস্থায় দুটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া জরুরি – এক, আশ্রয় পরবর্তী পর্যায়ে দেশের অভ্যন্তরে রোহিঙ্গা সমস্যাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হবে? দুই, অতীত চুক্তিভঙ্গের অভিজ্ঞতার আলোকে মায়ানমার-বাংলাদেশ সম্পর্ক ও রোহিঙ্গা সমস্যাকে দুনিয়ার সামনে সরকার কীভাবে উপস্থাপন করবে?

জাতিগত সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান পুঁজিবাদে নেই। জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক, যেকোন ধরনের পুঁজিবাদী শক্তির কথাই ধরি না কেন, তারা সুযোগের সন্ধানে থাকবে। এ থেকে যতটুকু ফায়দা তোলা যায়, তা তুলবে। তাই এখন শুধু মানবিক সাহায্য নয়, দরকার রাজনৈতিক সামাজিক ঐতিহাসিক কর্তব্য নির্ধারণ। যাতে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ জনগণকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

শাসকের কাছে এই চোখের জলের মূল্য নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর) জীবনে নাভিশ্বাস উঠার অবস্থা। এর মধ্যে 'ভাত দেবার মুরোদহীন' সরকার যদি মুখের গ্রাসটুকুও কেড়ে নেয় তবে আর থাকে কী?

বলছিলাম বগুড়ার হতদরিদ্র রিকশা শ্রমিকদের কথা। গত ৪ অক্টোবর বগুড়া শহরে যানজট কমানোর অজুহাতে শহরে ব্যাটারিচালিত রিকশা বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন। বিআরটিসি'র পরিকল্পনা হিসাবে তারা বগুড়া শহরে ব্যাটারি চালিত রিকশা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে। তাদের যুক্তি হলো – এই রিকশাগুলোর কোনো লাইসেন্স নেই, এদের চলাচল অনিয়ন্ত্রিত, রাস্তায় নানা দুর্ঘটনা ঘটায়, তারা ট্রাফিক জ্যামের অন্যতম কারণ ইত্যাদি। তাই পূর্বঘোষণা ছাড়াই আচমকা অভিযান চালিয়েছে জেলা প্রশাসন। কেবল আটক নয়, গুড়িয়ে দিয়েছে রিকশাগুলো। বাহাদুরের কাজই করেছে বটে!

যদিও জীবনের সম্বলটুকু হারিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠা মানুষগুলো আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কেউ তা জানে না। এই মানুষগুলো প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের হাতে-পায়ে ধরে, কাকুতি মিনতি করেও তাদের আয়ের উৎসকে বাঁচাতে পারেনি। গত ক'দিনে যোগাযোগ মাধ্যমে খবর-ছবিগুলো প্রচারিত হয়েছে। কী ভীষণ কষ্টের, অসহনীয় যন্ত্রণার! হতদরিদ্র এই মানুষগুলোর চোখের নোনা জলের ছবি ছুঁয়ে গেছে অনেককে। কেবল মন গলেনি শাসকদের। অবশ্য তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ক্ষমতার মসনদে থেকে মানুষের উপর ছড়ি ঘুরাতে হলে আর শ্রমজীবীদের রক্ত-ঘাম নিংড়ানো সম্পদ আত্মসাৎ করতে হলে তো এমন অমানবিক-ই হওয়া চাই!

কিন্তু কিছু প্রশ্ন সামনে চলে আসে। রিকশাই কি যানজটের মূল কারণ? তা-ই যদি হয়, তবে এই চালকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কী করা হয়েছে? কেন এই মানুষগুলো রিকশা চালায়? যারা এই রিকশাগুলো বাজারজাত করে তাদের বিরুদ্ধে কি সরকার কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে?

খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এই রিকশা চালকদের বেশিরভাগই গ্রাম থেকে শহরে এসেছে পেট চালানোর দায়ে। উন্নয়নের মহাসমারোহে গ্রামে তেমন কোনো কাজ নেই! কেবল দিনমজুরি করেও সংসার চালানো যায় না। কেননা জিনিসপত্রের দাম শ্রমজীবী মানুষের নাগালের অনেক বাইরে। তাই বাড়তি কিছু আয়ের রাস্তা বের করতে তারা রিকশা চালায়। শহরেই যে সব ধরনের কাজ আছে তাও নয়। রিকশা চালানোর কাজটা একটু বেশি পাওয়া যায়। শরীরের রক্ত পানি করে, পাশবিক পরিশ্রম করেই তবে তারা দুটো টাকা আয় করতে পারে। এই টাকা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চলে, হয়তো ছেলে-মেয়ের পড়াশুনা আর যৎসামান্য চিকিৎসার খরচটাও। রিকশাটাও হয়তো কোনো এনজিও বা মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে কিনে কিংবা প্রতিদিন তিনশ টাকার বিনিময়ে চালাতে পারে। এতকিছু পর যদি সেই উপার্জনের বাহনকে গুড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে বেঁচে থাকার অবলম্বন আর থাকে কিছু? এ তো জীবনকেই গুড়িয়ে দেবার শামিল।

যানজটের দায় যে রিকশাওয়ালাদের উপর দেয়া হচ্ছে, তা-ই বা কতটুকু সঠিক? যানজটের তো প্রধান কারণ প্রাইভেট গাড়ির আধিক্য, পাবলিক যানের স্বল্পতা। বগুড়া শহরে তো কোনো পাবলিক যান নেই। এছাড়াও রয়েছে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং, ফিটনেসবিহীন গাড়ি চালনা করা, খানা-খন্দপূর্ণ রাস্তা ইত্যাদি। এগুলোর কোনোটারই ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ না নিলেও রিকশাচালকদের উপরই দায় চাপালো। প্রশাসন কি পারবে যানজটের প্রধান কারণ প্রাইভেট গাড়িগুলো বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিতে? পারবে না। কেননা ওই গাড়িতে বসে টাকাওয়ালা ধনিক শ্রেণি। তাদের গায়ে ফুলের টোকাও শাসকরা পড়তে দেয় না।

অথচ মেহনতি মানুষগুলোর রক্ত-ঘামেই চলে আমাদের দেশ। এদের ট্যাক্সে টাকাতেই প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের বেতন-বোনাস আসে। তাদের বিলাসবহুল গাড়ির ডিজেল-পেট্রোলের যোগানও আসে এদের পরিশ্রমের পয়সায়। শ্রমজীবী মানুষরাই দেশের সমস্ত সম্পদ সৃষ্টি করে। কিন্তু তাদের সাথেই গদিতে বসে থাকা একদল সুবিধাভোগী কর্মকর্তা প্রতিনিয়ত নির্মম আচরণ করে! এই আসকারা তারা পায় কোথা থেকে? পায় বিদ্যমান এই ব্যবস্থা থেকেই। যেখানে সংখ্যালঘু সুবিধাভোগীদের জন্য রাষ্ট্রের সমস্ত আয়োজন থাকে। তারা তাঁদের শোষণ বলবৎ রাখার জন্য অযৌক্তিক-অনৈতিক সবকিছুই করতে পারে। আইন-আদালত-প্রশাসন সবই থাকে তাদের অনুগত। এই ব্যবস্থার নাম পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

বগুড়ায় যারা রিকশা গুড়িয়ে দিল, তারা কি একবার ভেবেছে তাদের এক সিদ্ধান্তের বলি হয়ে এতগুলো মানুষ যে পথে বসে যাবে? তাদের যে দিনের পর দিন না খেয়ে, বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে? তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ যে ধুলায় মিশে যাবে? না, তারা ভাবতে পারেনি, পারবেও না। শ্রমজীবী মানুষের সাথে সম্পর্কহীন, কেবল জোঁকের মতো রক্ত শোষণ করা শাসকরা কোনোদিন শোষিতের কান্না শুনতে পায় না। তাই তাদের জন্য প্রয়োজন কঠিন প্রত্যাঘাতের। যেদিন চোখের জল কষ্টের নিনাদ নয় বরং তেজের মশাল জ্বালাবে- সেদিনই কেবল নড়ে উঠবে ওই অমানুষদের ক্ষমতার মসনদ। সেজন্য প্রয়োজন সংগঠিত হবার, প্রয়োজন তেমন জাতের সংগঠন। কেননা শাসকরা নিপীড়িতদের কষ্টোপার্জিত সম্পদ আত্মসাৎ করে আনন্দ পেলেও, ভয় পায় তাদের সম্মিলিত শক্তিকে। সেই লক্ষ্যেই আমাদের প্রত্যেকের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। বগুড়ার রিকশা শ্রমিকভাইদেরও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

মারণাস্ত্র ব্যবসার মরণব্যাধিতে আক্রান্ত আমেরিকা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মানে নেই। ফলে হতাশাগ্রস্ত হয়ে ড্রাগসে আসক্তি, বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষ, সংখ্যায় যা ২ ২লাখ ৩৯ হাজার ৭৫১ জন, তারা কারাবন্দী।

এই সামাজিক পরিস্থিতিই আজ আমেরিকায় এমন নৃশংস মানুষের জন্ম দিচ্ছে। ফলে এরকম একটি পরিস্থিতিতে আগ্নেয়াস্ত্রের বিক্রিতে-ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করাই হতো স্বাভাবিক। আমেরিকার বিবেকবান শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা এই দাবিতে বহুদিন থেকে সোচ্চার। কিন্তু সেরকম কোনো পদক্ষেপ মার্কিন শাসকরা নিচ্ছে না কেন? বরং অস্ত্রই মানুষকে নিরাপত্তা দেবে, প্রত্যেক স্বাধীন মানুষের এটি অধিকার – নিরাপত্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে এই রকম ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে দিয়ে অস্ত্রের বাজারকে আরও প্রসারিত করা হচ্ছে। সেই কারণেই আমেরিকান অস্ত্রব্যবসায়ীদের সংগঠন 'ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন' বিগত মার্কিন নির্বাচনে জোটবদ্ধ হয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছিল। এই অস্ত্রব্যবসায়ীরা চায় না আমেরিকান অস্ত্র আইন সংশোধিত হোক। কেননা আর্থিক মন্দায় ভুগতে থাকা সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার পুঁজিপতিরা অস্ত্রব্যবসাকেই করে তাদের পাখির চোখ। আর তাদের ব্যবসার স্বার্থেই প্রণীত হয় আমেরিকার যাবতীয় অভ্যন্তরীণ আইন ও পররাষ্ট্রনীতি। তাই 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র নামে অস্ত্রের বাজারকে চাঙা রাখতে তথা আমেরিকান অর্থনীতি সচল রাখতে গোটা দুনিয়ায় স্থানীয় ও আঞ্চলিকভাবে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ লাগিয়ে রেখেছে। মিথ্যে অজুহাতে আফগানিস্থান, ইরাক, লিবিয়াসহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে। আর সেই ধ্বংসস্তুপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো জন্ম লাভ করছে আইএসসহ বিভিন্ন জঙ্গিসংগঠন। যারা বেঁচে থাকার রসদ অর্থাৎ অস্ত্র পাচ্ছে খোদ আমেরিকার কাছ থেকে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে প্রাকৃতিক সম্পদ, তেল দখল করে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ তার অন্তিম শ্বাস গ্রহণ করছে। আর নিজ দেশে মুনাফার লোভে যে অস্ত্রকে তারা মানুষের হাতে 'অধিকার' হিসেবে তুলে দিয়েছে তা-ই আজ আমেরিকার সমাজের স্তরে স্তরে মরণব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। মনুষ্যত্ববিনাশী এই সর্বনাশের স্রোতকে রুখবে সেই সাধ্য কি পুঁজিবাদী সমাজের আছে?

বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনে সরকার কতটুকু দায়িত্ব পালন করছে?

বন্যা অতিক্রান্ত হয়েছে প্রায় এক মাস। প্রচার মাধ্যমগুলোতে এখন এর খুব একটা প্রচার নেই। সরকারও প্রায় নিশ্চুপ। কিন্তু কেমন আছে বন্যাদুর্গত মানুষগুলো? আমরা দেখছি, সরকার ও রাষ্ট্রের হর্তাকর্তাগণ 'শান্তি' আর 'উন্নয়ন'র আওয়াজ তুলছে। কিন্তু এর কতটুকু প্রভাব আছে সেই বন্যাকবলিত মানুষের জীবনে? এই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষেরাই তো আমাদের খাদ্য যোগায়, তাদের শ্রমে-ঘামে ফসলের বাম্পার ফলন হয়। কিন্তু কতই না ভয়াবহ দুর্দশার মধ্যে কাতরাচ্ছে সেই সহায় সম্বলহীন মানুষেরা! প্রায় দেড়শ'র বেশি মানুষের করুণ মৃত্যু আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল – এদেশের প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগে সাধারণ মানুষের নিদারুণ অসহায়ত্ব।

বারবার বন্যা-ঝড়-অতিবৃষ্টি ইত্যাদি দুর্যোগ প্রাকৃতিক কারণেই আসবে। কিন্তু শুধুই কি প্রাকৃতিক ব্যাপার? না কি ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসের পরিমাণ বৃদ্ধির পিছনে মনুষ্যসৃষ্ট কারণও দায়ী? এ প্রশ্ন আজ ভাবার সময় এসেছে। প্রায় ৫ লাখ হেক্টরের অধিক জমির ফসল বন্যায় ভেসে গেছে। কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। সেখানকার দৈনন্দিন জীবনে এখন যেসব সংকট নানাভাবে দেখা দিচ্ছে – তা ভাবলে কোনো বিবেকবান মানুষেরই শান্তিতে থাকার কথা নয়। যেকোনো মানুষের চোখে হাজারো করুণ দৃশ্য অপেক্ষা করছে সেখানে।

বন্যার পানি সরে গিয়েছে। কিন্তু এখনও মানুষ ফিরে পায়নি তাদের স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবন। গ্রামগুলোর অধিকাংশ পরিবারের পুরুষেরা কাজের আশায় পাড়ি জমাচ্ছে শহরে। শহরে গিয়েও পড়ছে ভিন্ন এক অনিশ্চিয়তার মধ্যে। কারো কারো ক্ষেত্রে ঋণের বোঝা এতই ভারী যে বাড়িতে ফেরাও কঠিন হয়ে পড়েছে। বন্যাদুর্গত এলাকায় শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই ঋণগ্রস্ত। চাষের ফসল ঘরে তুলতে না পেরে পুরনো ঋণ শোধ করাও সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্যে তারা আবার নতুন করে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে। দেখা যাচ্ছে যে, একই পরিবার অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে ঋণী। উপার্জনের সুযোগ খোঁজার আগেই দেখতে পাচ্ছে বাজারে সবকিছুর মূল্য আকাশছোঁয়া। এমনকি চালের মূল্যও নাগালের বাইরে। ফলে খাদ্যের কোনো নিশ্চয়তা না থাকায় লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন।

নামমাত্র ত্রাণের ব্যবস্থা করে সরকার তার দায়িত্ব শেষ করেছে। অথচ মানুষর ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, মেরামতের টাকাও নেই। বৃদ্ধ ও শিশুদের অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ। অনেক বৃদ্ধই বয়স্ক ভাতাও পান না। পেলেও যতটুকু অর্থ তা এই মুহূর্তের জন্য একেবারেই অপ্রতুল। তাই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তাদের নামতে হচ্ছে রাস্তায়। অর্থের অভাবে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। অনেককে পড়াশুনায় ইস্তফা দিতে হচ্ছে। বাড়ছে শিশুশ্রম। বন্যার এই ভয়াবহতা শিশুমনে বৈকল্য আনতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা। অনেক স্কুল-কলেজের শিক্ষাকার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি। প্রায় ৩০ হাজারের বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেগুলোর দ্রুত সংস্কারের দাবি উঠলেও সরকারের উপর মহল থেকে কোনো উদ্যোগই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সন্তানরা বেতন দিতে অক্ষম, পড়াশুনার উপকরণ সামগ্রীও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই যৌক্তিক কারণেই সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট দাবি করেছিল – শিক্ষার্থীদের অন্তত একবছরের বেতন মওকুফ ও তাদের শিক্ষা উপরকরণ সরবরাহের। সেই দাবির প্রতিও সরকারের কোনো কর্ণপাত নেই। এমন অবস্থায় শিক্ষাজীবন একটা অনিশ্চিত অবস্থায় পড়েছে। নিরুপায় ও বিভ্রান্ত হয়ে অন্যায় অপকর্মে যুক্ত হয়ে পড়েছে অনেকে। এর বিষময় প্রভাব সমাজজীবনে আরও ভয়াবহ রূপে দেখা দিবে।

বন্যার এই সময়টাতে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ-সার বিতরণ, সুদমুক্ত কৃষিঋণ দান এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান-রাস্তাঘাট-সেতু সংস্কার করার দাবি। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই সরকার গুরুত্বের সাথে নেয়নি। বরং দায় এড়িয়ে গিয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক ইস্যু নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। এভাবে মানুষকে অশান্তি ও দুর্ভোগের মধ্যে রেখে মুখে যতই শান্তি ও উন্নয়নের বুলি আওড়ানো হোক না কেন– সাধারণ মানুষের কাছে তার কোনো তাৎপর্য নেই।

সবদিক থেকে সর্বস্বান্ত হওয়া বন্যাকবলিত মানুষের জীবনের কান্না হয়তো সহজে থামবে না। কিন্তু এটাও সত্য যে, এই মানুষরা তাদের অদম্য সংগ্রামের পথেই বেঁচে থাকার উপায় বের করবেন। তথাকথিত জনপ্রতিনিধিরা বসন্তের কোকিল। ভোটের স্বার্থে তারা নানা কিছু বলবে। মানুষকে বারবার প্রতারিত করবে। তাতে সত্যিকারের কোনো পরিবর্তন আসবে না। কেননা ক্ষমতাসীনদের কাছে সাধারণ মানুষ হলো ক্ষমতায় যাবার সিঁড়ি। শাসকদের এই চরিত্র আজ পরিষ্কারভাবে বোঝার সময় এসেছে। তাই বন্যা কেবল জনগণের দুর্দশাই বয়ে আনেনি, শাসকদের চিনিয়ে দিতেও সাহায্য করছে।

আবারও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি!

লাভের গুড় খাচ্ছে ব্যবসায়ীরা, জনগণের ঘাড়ে ক্ষতির বোঝা

দাম বৃদ্ধি ঘটিয়ে জনগণকে আবারো বিদ্যুতের শক দেওয়ার পরিকল্পনা আঁটছে সরকার। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) বিদ্যুতের পাইকারি দাম ১১.৭৮ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। নামে গণশুনানি হলেও (জন)গণের মতামত শোনা হয়েছে এমন কোনো নজির নেই। এবারেও তাই হয়েছে। বিপিডিবি পাইকারি বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে ইউনিট প্রতি ৭২ পয়সা। বিইআরসি সায় দিয়েছে ৫৭ পয়সা বাড়ানোর। বিদ্যুতের পাইকারি দাম বাড়লে খুচরা অর্থাৎ গ্রাহক পর্যায়েও দাম বাড়বে। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণকারী কোম্পানি, সংস্থাগুলিও দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। ফলে জনগণকে গুণতে হবে বাড়তি অর্থ। জনজীবনের নানা ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়বে। বাড়ির মালিক বাসা ভাড়া বাড়িয়ে দিবে। গাড়ি ভাড়া বাড়বে। বাড়বে নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্রের দামও।

স্বঘোষিত 'উন্নয়নের সরকার' দশম বারের মতো বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিলো। কেন এই দাম বৃদ্ধি করা হচ্ছে? আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী নামধারী বাহিনী যেমন সংবাদ সম্মেলনে ক্রসফায়ারের একই গল্প প্রতিবারই পাঠ করেন, ঠিক তেমনি সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের আজ্ঞাবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোও পুরনো কথারই জাবর কাটেন। এর আগে নয়বার দাম বাড়াতে গিয়ে যেসব যুক্তি করেছেন এবারও তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি। বলেছেন-"তরল জ্বালানীর ব্যবহার, বেসরকারি খাত থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় এবং জ্বালানি ব্যয়ের অংশ বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে উৎপাদন মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের মধ্যে ঘাটতি অর্থাৎ লোকসান দূর করার জন্য দাম বাড়াতে হচ্ছে।"

মূল্যবৃদ্ধির এই যুক্তি কতখানি সঠিক আর প্রকৃত কারণই বা কী – আমাদের দল বাসদ (মার্কসবাদী) সহ তেল-গ্যাস জাতীয় কমিটি বিভিন্ন সময়ে সেই ব্যাখ্যা তুলে ধরেছে। সরকারের যুক্তির অসারতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মূল্য বৃদ্ধির মূল কারণ যে আসলে সরকারের বিদ্যুৎ সম্পর্কিত কায়েমী-বাণিজ্যিক নীতি-পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটাই দেখিয়েছে। কিন্তু ব্যাবসায়ীগোষ্ঠীবান্ধব সরকার বিদ্যুতের নীতি-পদ্ধতিগত কোনো পরিবর্তন আনেনি।

সরকারের পাওয়ার ডেভলপমেন্ট বোর্ডের (বিপিডিবি) হিসেব মতে, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠানটির দেনার পরিমাণ ছিল ৯১৫ কোটি টাকা। এই দেনা ফি বছর বাড়তে *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ভারতে সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ হত্যা

ধর্মীয় উগ্রতা লুপ্ত করছে মনুষ্যত্ব-মানবিকতা

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয়েছেন ভারতের বিশিষ্ট সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ। গত ৫ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরু শহরের রাজরাজেশ্বরী এলাকায় নিজ বাড়ির দরজায় তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তিনি ছিলেন আরএসএস-বিজেপিসহ উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কঠোর সমালোচক, মুক্ত চিন্তা ও যুক্তিবাদের সমর্থক। লঙ্কেশ তার পত্রিকার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপক্ষে এবং বিজেপি'র দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদের বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করতেন। এছাড়া তিনি হিন্দু ধর্মের দলিত (নিম্ন বর্ণের লোক) ছাত্রআন্দোলন সমর্থন করতেন। বিজেপি নেতাদের দুর্নীতির বিষয়ে বিভিন্ন খবর তিনি তার সম্পাদিত কাগজে প্রকাশ করেছেন। নির্ভীক এবং স্পষ্টভাষী হিসাবে তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল সঙ্ঘ পরিবারের চক্ষুশূল।

ভারতের প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল বিজেপি সরকার হিন্দুত্ববাদী চিন্তা উস্কে দিয়ে ভারতের জনগণকে বিভক্ত করছে প্রতিদিন। একটি দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করে। তারা প্রত্যেকে অপরের ক্ষতি না করে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে – এটাই একটি গণতান্ত্রিক দেশের রীতি। এর বদলে যদি দেশের বেশিরভাগ মানুষ যে ধর্মের লোক সেই ধর্মীয় অনুভূতিকে ধ্বংসাত্মক পথে উস্কে দেয়া হয়, তবে অনেক সাধারণ মানুষ ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে এতে যুক্ত হয়ে পড়ে। মানুষ তখন আর মানুষ থাকে না। প্রচণ্ড উগ্রতায় নিজের ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিবিদরা তখন এসব ঘটনা থেকে নিজেদের ফায়দা তুলেন। রাষ্ট্রের ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রকৃতপক্ষে গোটা দেশ নিয়ন্ত্রণ করে যে পুঁজিপতিশ্রেণি, তারাই একেবারে মেপে মেপে হিসেব করে এই সকল ঘটনা ঘটায়।

সম্প্রতি ভারতে গরুর মাংস বহন করার কারণে গণপিটুনি খেয়ে স্টেশনে মারা গেছে এক তরুণ। বাসায় গোমাংস রাখার দায়ে গ্রামবাসী মিলে খুন করেছে, কিংবা গরু পাচারকারী সন্দেহে পিটিয়ে মেরেছে – এমন ঘটনা তো অহরহ। ধর্মীয় গোঁড়ামি আর কুসংস্কার কত গভীর হলে গরুর জন্য মানুষ কেঁদে অস্থির হয় আর মানুষকে কীটপতঙ্গের মতো হত্যা করে – তা আমরা এতদূর থেকেও বুঝতে পারি।

ভারতের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীসহ প্রগতিশীল দলসমূহ ক্রমান্বয়ে ঘটে চলা এ সকল ঘটনার প্রতিবাদ করছেন, সরব হয়ে উঠেছেন। অনেকেই রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ফেরত দিয়েছেন, রাস্তায় নেমেছেন। গোটা ভারত আজ প্রতিবাদমুখর। নৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য একজন প্রবীণ সাংবাদিকের প্রাণ হারানোর ভয়ংকর ঘটনা ভারতের নাগরিক সমাজকে আন্দোলিত করে তুলেছে। গৌরী লঙ্কেশের আগে একই কায়দায় হত্যা করা হয়েছে মহারাষ্ট্রের নরেন্দ্র দাভোলকর (২০১৩) ও গোবিন্দ পানসারে (২০১৫) এবং কর্নাটকের এমএম কালবুর্গিকে (২০১৫)। এঁরা প্রত্যেকেই হিন্দুত্ববাদীদের কঠোর সমালোচক ছিলেন। এঁদের হত্যাকারীরা মোটরসাইকেলে করে এসে হামলা করেছে। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডে একই ধরনের বুলেট ব্যবহার করা হয়েছে। 'রাষ্ট্রবিরোধিতার' অভিযোগে খুনের হুমকি দেয়া হয়েছে সাংবাদিক সাগরিকা ঘোষ, লেখিকা শোভা দে, অরুন্ধতী রায়, কবিতা কৃষ্ণণ ও শেহলা রশিদকে।

বাংলাদেশের অনেক লোকই হিন্দুত্ববাদীদের এই কাণ্ডের বিরোধী। কিন্তু আমাদের দেশের কী অবস্থা? একের পর এক হত্যাকাণ্ড কি এদেশেও ঘটছে না? যারা নিহত *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

লাস ভেগাসে হামলা

মারণাস্ত্র ব্যবসার মরণব্যাধিতে আক্রান্ত আমেরিকা

সম্প্রতি আমেরিকার নেভাদা অঙ্গরাজ্যের লাস ভেগাস শহরে এক বন্দুকধারীর গুলিতে ৫৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন, আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৫ শতাধিক। আমেরিকার মতো দেশ, যেখানে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা খাতে প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়, সেরকম একটি দেশে হামলার ঘটনা গোটা বিশ্বের মানুষের বিস্ময় উদ্রেক করেছে। হাজার হাজার মানুষ সেদিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে একটু ফুরসত পেয়ে একত্রিত হয়েছিল আনন্দোৎসবে। কিন্তু বন্দুকধারীর হামলায় মুহূর্তের মধ্যেই এটা পরিণত হয় শোকোৎসবে। প্রাণভয়ে মানুষ দিগ্বিদিক ছুটছে। স্বজন হারানোর বেদনায় – হাহাকারে লাস ভেগাসের আলোকোজ্জ্বল আকাশে নেমে আসে অন্ধকারের ছায়া, বাতাস হয়ে ওঠে ভারী, বিষণ্ন। ঠাণ্ডা মাথায় একজন মানুষের পক্ষে কী করে সম্ভব এমন নারকীয় হত্যাকা!

হামলাকারী স্টিফেন প্যাডক সম্পর্কে আমেরিকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোও বলছে, তার মনোবিকার ছিল। এর আগে গত বছরও অরল্যান্ডোতে ঠিক একই রকমভাবে এক বন্দুকধারীর হামলায় নিহত হয়েছিল ৪৮ জন সাধারণ মানুষ। এবারে লাস ভেগাসে হামলাসহ গত এক বছরের মধ্যে এটি ২৭৩তম ও এক মাসের মধ্যে ২৯তম হামলার ঘটনা। 'গান ভায়োলেন্স আর্কাইভ ড্যাটাবেসে'র তথ্যানুসারে ২০০১-১৪ সালের মধ্যে আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারিয়েছে ৩ হাজার ৪১২ জন (নাইন-ইলেভেনের হামলাসহ)। আর একই সময়ে বন্দুকধারীদের আক্রমণ ও আত্মহত্যায় জীবন বিনাশ হয়েছে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৫ জন মানুষের। 'হার্ভাড স্কুল অব পাবলিক হেলথ'স কন্ট্রোল রিসার্চ সেন্টারের মতে, অস্ত্রের সহজলভ্যতাই আমেরিকার খুন বেশি হওয়ার প্রধান কারণ।

আমেরিকান সংবিধানে নাগরিকদের জন্য অস্ত্রের অবাধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং একে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এই অধিকার ভোগ করার ফলে সারা দুনিয়ায় বেসামরিক মানুষের কাছে যে পরিমাণ অস্ত্র আছে তার অর্ধেকের বেশি এখন আমেরিকার মানুষের হাতে। অর্থাৎ আমেরিকার প্রতি ১০০ জন নাগরিকের মধ্যে ৮৮ জনের কাছেই মারণাস্ত্র আছে। মারণাস্ত্রের এই বিপুল বিস্তার আজ আমেরিকার সমাজের মরণ ডেকে আনছে। শিশুদের স্কুল কিংবা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, উৎসবে-কনসার্টে কিংবা স্টেশনের মতো জনবহুল স্থানগুলোতে হামলার ঘটনা ঘটছে নিয়ত। প্রশ্ন হলো, কেন কথিত স্বর্গরাজ্যে দিন দিন উন্মাদ ও অস্ত্রধারীদের হাতে সাধারণ মানুষ জিম্মি হয়ে পড়ছে? আর কেনই বা সমাজে এরকম মানুষের সংখ্যা বাড়ছে?

এর কারণ বুঝতে হলে আমাদের একটু তাকাতে হবে আমেরিকার সমাজের ভেতরের দিকে। আমেরিকার আলো ঝলমলে যে শহরগুলোর চিত্র আমরা দেখি, এ হচ্ছে একটি ছবি। আছে আরেকটি ছবিও। যেখানে বহু মানুষের জীবনে আলোর রেখা পৌঁছে না। রয়েছে প্রচণ্ড দারিদ্র্য, বেকারত্বের গ্লানি, ঋণের পাহাড়। আজ আমেরিকায় আর্থিক বৈষম্য প্রকট হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই বৈষম্যের ফলশ্রুতিতেই দানা বেঁধেছিল অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট আন্দোলন। শ্লোগান উঠেছিল ৯৯ শতাংশ বনাম ১ শতাংশ। একদিকে আর্থিক বৈষম্য, শোষণ-নিপীড়ন, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে বিভেদ অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমাজের ভোগ-জৌলুসের আকর্ষণ – এই দুই মিলে আমেরিকার সমাজে প্রচণ্ড সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করছে। সংকট থেকে মুক্তির রাস্তা না পেয়ে মানুষ হয়ে পড়ছে আরো আত্মকেন্দ্রিক। মানবিক মূলবোধের চূড়ান্ত অবনমন ঘটছে। নৈরাশ্যের আধার চারদিক থেকে মানুষকে ঘিরে ধরেছে – জীবনের সামনে কোনো নূতন আশা নেই, বেঁচে থাকার মহত্তর কোনো *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org